অধ্যায় 8 মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন
Human Physiology : Blood & Circulation

মানবদেহের অভ্যন্তরে এক বিশেষ তন্ত্র খাদ্যসার, শ্বসন গ্যাস ও রেচন বর্জ্য পরিবহন এবং দেহের তাপমাত্রা ও বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও রোগজীবাণু প্রতিরোধের কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এর নাম রক্ত সংবহনতন্ত্র। **রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ এবং হৃৎপিন্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে।** ব্রিটিশ চিকিৎসক Willium Harvey, 1628 খ্রিস্টাব্দে মানুষের রক্ত সংবহন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে মানব রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং হৃৎপিণ্ডের কিছু জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ❐ রক্ত
- ❐ রক্ত তঞ্চন
- ❐ লসিকা
- ❐ টনসিল
- ❐ কার্ডিয়াক চক্র
- ❐ ব্যারোরিসেপ্টর
- ❐ অ্যানজাইনা
- ❐ হার্ট অ্যাটাক
- ❐ পেস মেকার
- ❐ অপেন হার্ট সার্জারি

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❐ রক্তকণিকা ও লসিকা সম্পর্কে	পাঠ ১	রক্ত
❐ রক্ত জমাট বাঁধার কারণ	পাঠ ২	রক্তকণিকা
❐ ব্যবহারিক : রক্তের কণিকাসমূহ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন	পাঠ ৩	লসিকা
❐ হৃৎপিণ্ডের গঠন	পাঠ ৪	রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন
❐ হার্টবিটের দশাসমূহের ব্যাখ্যা	পাঠ ৫	ব্যবহারিক : রক্তকণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ
❐ হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা	পাঠ ৬	হৃৎপিণ্ডের গঠন
❐ মানবদেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা	পাঠ ৭	হৃদস্পন্দন ও এর বিভিন্ন দশা
❐ হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয়	পাঠ ৮	হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ
❐ হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে পেসমেকারের কার্যক্রম	পাঠ ৯	রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর ও আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা
❐ ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস এবং এনজিওপ্লাস্টির ব্যাখ্যা	পাঠ ১০	মানবদেহে রক্ত সংবহন
	পাঠ ১১	হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয়
	পাঠ ১২	হৃদরোগের চিকিৎসা

রক্ত (Blood)

রক্তরস নামক তরল মাতৃকায় ভাসমান তিন ধরনের রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত টিস্যুকে রক্ত বলে। রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন রক্তবাহিকা দেহের সকল কোষে পুষ্টি, ইলেক্ট্রোলাইট, হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি, O_2, ইমিউন কোষ ইত্যাদি বহন করে এবং CO_2 ও বর্জ্য পদার্থ প্রত্যাহৃত হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানবদেহে প্রায় ৫–৬ লিটার রক্ত থাকে অর্থাৎ দেহের মোট ওজনের প্রায় ৮%। রক্ত সামান্য ক্ষারীয়। এর pH মাত্রা ৭.৩৫–৭.৪৫ (গড়ে ৭.৪০) এবং তাপমাত্রা ৩৬-৩৮° সেলসিয়াস। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে বেশি, প্রায় ১.০৬৫। অজৈব লবণের উপস্থিতির জন্য রক্তের স্বাদ নোনতা। সুনির্দিষ্ট বাহিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের সবখানে সঞ্চালিত হয়। রক্তের সান্দ্রতা পানির তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বেশি। লোহিত কণিকা ও প্লাজমা প্রোটিনের জন্য মূলত এটি হয়ে থাকে।

CamScanner

রক্তের সাধারণ কার্যাবলি (General Functions of Blood)

১. **পুষ্টিদ্রব্য পরিবহন :** বিভিন্ন খাদ্যসার যেমন–গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি অন্ত্র থেকে রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে।

২. **শ্বসন গ্যাস পরিবহন :** রক্ত O_2 কে ফুসফুস থেকে দেহকোষে এবং দেহকোষ থেকে CO_2 কে ফুসফুসে পরিবহন করে। এরিথ্রোসাইট (RBC) ও প্লাজমা প্রধানত এ কাজে অংশ গ্রহণ করে।

৩. **বিপাক নিয়ন্ত্রক দ্রব্যাদি পরিবহন :** রক্ত হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থগুলোকে তাদের ক্রিয়াস্থলে বহন করে নিয়ে যায়।

৪. **বর্জ্য পদার্থ পরিবহন :** কোষীয় বিপাকে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ, যেমন–ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, বিলিরুবিন, CO_2 দেহ থেকে অপসারণের জন্য বৃক্ক, যকৃত, ফুসফুস, ঘর্মগ্রন্থি ইত্যাদি অঙ্গে পরিবহন করে।

৫. **পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ :** রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে এবং প্রোটোপ্লাজমে পানি সরবরাহ করে। আবার পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্ত অতিরিক্ত পানি বৃক্কে প্রেরণ করে মূত্ররূপে বর্জন করে। এভাবে রক্ত দেহের পানিসাম্য বজায় রাখে।

৬. **দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ :** রক্ত অধিকতর সক্রিয় টিস্যুতে (যেমন–পেশি, যকৃত) উৎপন্ন তাপের সারাদেহে বিস্তার ঘটিয়ে দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে। আবার কোনো কারণে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে রক্ত দ্রুত দেহের পরিধিতে সঞ্চালিত হয়। এসময় বাষ্পীভবনের ফলে দেহের পরিধি দিয়ে তাপ নির্গত হয়। এভাবে রক্ত দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৭. **আয়নের সমতা রক্ষা :** রক্ত দেহের কোষ এবং তার চারদিকে অবস্থিত তরলের মধ্যে আয়নের সমতা বজায় রাখে।

৮. **দেহের প্রতিরক্ষা :** রক্তের শ্বেতকণিকা (WBC) **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করে দেহের প্রতিরক্ষায় অংশ নেয়।

৯. **সঞ্চয় অঙ্গ থেকে খাদ্য পরিবহন :** রক্তের মাধ্যমে প্রয়োজনে সঞ্চয় অঙ্গ থেকে খাদ্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গে পরিবাহিত হয়ে থাকে।

১০. **সঞ্চয় ভান্ডার :** **প্লাজমা প্রোটিন** দেহের প্রোটিনের সঞ্চয় ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। রোজা অথবা উপবাসের সময় এবং খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমে গেলে দেহের টিস্যুগুলো উক্ত সঞ্চয় ভান্ডার থেকে প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে।

১১. **অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা (p^H) নিয়ন্ত্রণ :** প্লাজমা ও লোহিত কণিকার ভিতর বিভিন্ন বাফার দ্রব্যের উপস্থিতির জন্য দেহের অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় থাকে।

১২. **রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ :** রক্তে অণুচক্রিকা ও প্লাজমা প্রোটিন সম্মিলিতভাবে ক্ষতস্থানে রক্ততঞ্চন ঘটিয়ে দেহের রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করে।

১৩. **অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা :** রক্ত দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভারসাম্য বা **হোমিওস্ট্যাসিস** (homeostasis) রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৪. **রোগ নির্ণয় :** রোগ, সংক্রমণ বা অন্য কোন কারণে দেহের কোনোরকম পরিবর্তন ঘটলে রক্তের উপাদানের পরিবর্তন দেখা যায়। এ কারণে রক্তের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় (clinical diagnosis) করা হয়।

রক্তের উপাদান (Components of Blood)

টেস্টটিউবে রক্ত নিয়ে সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে ঘুরালে রক্ত দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উপরের হালকা হলুদ বর্ণের প্রায় ৫৫% অংশের স্তরটি **রক্তরস** বা **প্লাজমা** (plasma) এবং নিচের গাঢ়তর বাকি ৪৫% অংশ **রক্তকণিকা** (blood corpuscles)। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকণিকাগুলো রক্তরসে ভাসমান থাকে। লোহিত কণিকার আধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়।

CamScanner

রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma)

রক্তরস বা প্লাজমা হচ্ছে রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৯০–৯২% এবং দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮–১০%। রক্তরসের কঠিন পদার্থ বিভিন্ন জৈব (৭–৯%) ও অজৈব (০.৯%) উপাদান নিয়ে গঠিত। কয়েক ধরনের গ্যাসসহ রক্তরসে নিম্নোক্ত **উপাদানগুলো** উপস্থিত থাকে।

ক. অজৈব পদার্থ (Inorganic constituents) : রক্তরসে অজৈব পদার্থের পরিমাণ প্রায় ০.৯%। এর মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তামা, আয়োডিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ. জৈব পদার্থ (Organic constituents) : রক্তের জৈব উপাদানগুলো হচ্ছে:

i. **প্লাজমা প্রোটিন (Plasma protein) :** জৈব পদার্থের মধ্যে প্লাজমা প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ৭.৫%। প্লাজমা প্রোটিনের মধ্যে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

i. **নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ (Nitrogenous excretory products):** রেচন পদার্থের মধ্যে রয়েছে– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, জ্যানথিন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি।

iii. **অন্যান্য পদার্থ :** গ্লুকোজ, ফ্যাট, কোলেস্টেরল, হরমোন, বিভিন্ন প্রকার এনজাইম রক্তরসে অবস্থান করে। বিভিন্ন ভিটামিন, রঞ্জক পদার্থ (বিলিরুবিন, ক্যারোটিন) ইত্যাদিও রক্তরসে পাওয়া যায়।

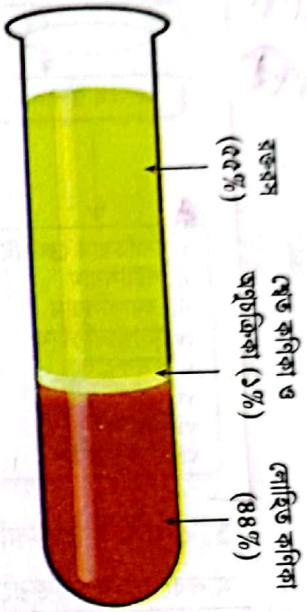

চিত্র ৪.১ রক্তরস ও কণিকার পরিমাণ

রক্তরসের কাজ : (i) রক্তের তারল্য রক্ষা করে এবং ভাসমান রক্ত কণিকাসহ অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ দেহের সর্বত্র বহন করে। (ii) পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গে বাহিত হয়। (iii) টিস্যু থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়। (iv) টিস্যুর অধিকাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তরসে বাইকার্বনেটরূপে দ্রবীভূত থাকে। (v) অল্প পরিমাণ অক্সিজেন বাহিত হয়। (vi) লোহিত কণিকায় সংবদ্ধ হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়। (vii) রক্তরসের মাধ্যমে হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়। (viii) রক্তরস রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে। (ix) রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করে। (x) যকৃত, পেশি ইত্যাদি অঙ্গে উৎপন্ন তাপশক্তিকে সমগ্র দেহে বহন করে দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে।

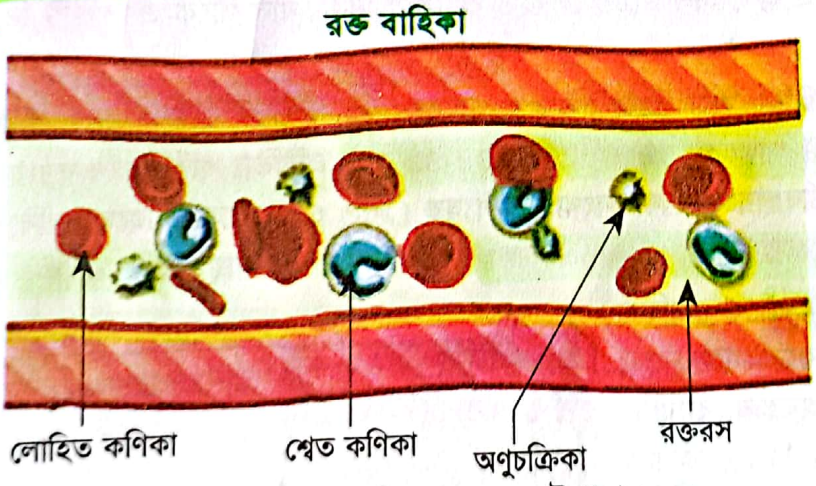

চিত্র ৪.২ : রক্ত বাহিকার ভিতরে রক্তের উপাদানসমূহ

রক্তকণিকা (Blood Corpuscles)

রক্তের উপাদান হিসেবে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে **রক্তকণিকা** বলে। এগুলো **হিমাটোপয়েসিস** (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। অন্যান্য কোষের মতো স্ববিভাজিত হয়ে সৃষ্টি হয় না বলে এদের কোষ না বলে **কণিকা** বলা হয়। রক্তের ৪৫% হলো রক্তকণিকা যা রক্তরসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা– **এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা, লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা ও প্লেইটলেট বা থ্রম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা**।

CamScanner

নিচের ছকের মাধ্যমে রক্তের উপাদানগুলো দেখানো হলো।

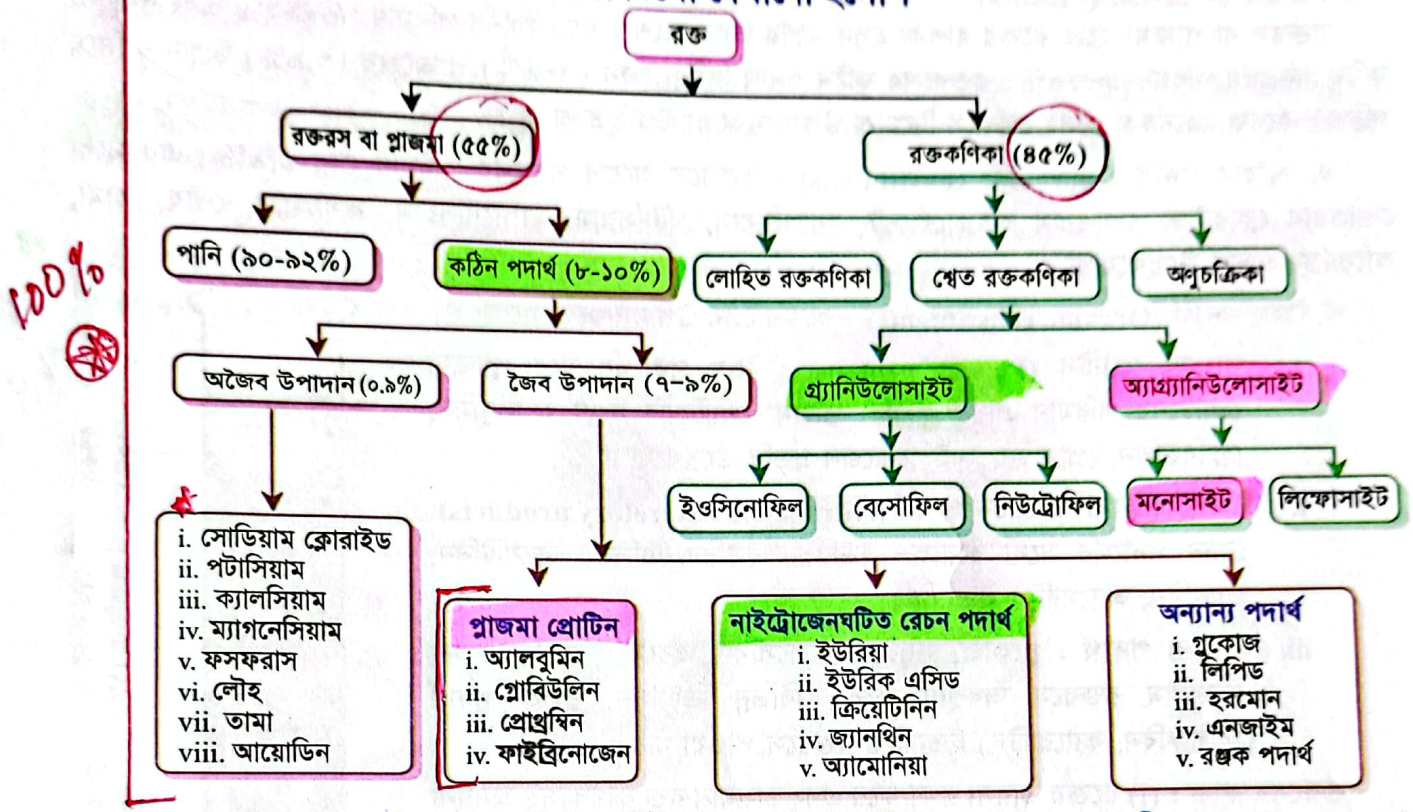

১. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte; গ্রিক, *erythros* = লোহিত + *kytos* = কোষ)

মানবদেহের রক্তরসে ভাসমান গোল, দ্বি-অবতল চাকতির মতো, নিউক্লিয়াসবিহীন কিন্তু অক্সিজেনবাহী হিমোগ্লোবিনযুক্ত, লাল বর্ণের কণিকাকে **লোহিত রক্তকণিকা** (Red Blood Corpuscles, RBC) বলে। এ ধরনের কণিকার গড় ব্যাস ৭.৩ μm ও স্থূলতা (thickness) প্রান্তের দিকে ২.২μm, কেন্দ্রে ১.০ μm অর্থাৎ কিনারা অপেক্ষা মধ্যভাগ অনেক পাতলা। স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে কেবল উটের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে-এ তথ্যটি নিয়ে সন্দেহ আছে।

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তকণিকার সংখ্যা হচ্ছে: **ভ্রূণদেহে ৮০–৯০ লাখ; শিশুর দেহে ৬০–৭০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষে ৫০-৫৪ লাখ; পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে ৪৪-৪৯ লাখ**। বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন– ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় কণিকার সংখ্যা বেশি হয়। লিঙ্গ ও বয়সভেদে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার নিচে থাকলে তাকে **রক্তাল্পতা** বা Anaemia বলে। লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল **১২০ দিন**।

লাল অস্থিমজ্জার **স্টেমকোষ** (stem cell) থেকে লোহিত রক্তকণিকা উদ্ভূত হয়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা কমে গেলে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। রক্তপাত, উঁচু স্থানে অবস্থান, ব্যায়াম, অস্থিমজ্জার ক্ষতি, কম মাত্রার হিমোগ্লোবিনসহ বিভিন্ন কারণে অক্সিজেন মাত্রা কমে যেতে পারে। বৃক্ক কম অক্সিজেন মাত্রা শনাক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে **এরিথ্রোপয়েটিন** (erythropoietin) নামে এক হরমোন উৎপন্ন ও ক্ষরণ করে। এ হরমোন লাল অস্থিমজ্জার মাধ্যমে লোহিত কণিকা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে। বেশি লোহিত রক্তকণিকা রক্তপ্রবাহে যুক্ত হলে রক্ত ও টিস্যুতে অক্সিজেনের মাত্রাও বেড়ে যায়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা বৃদ্ধি পেলে

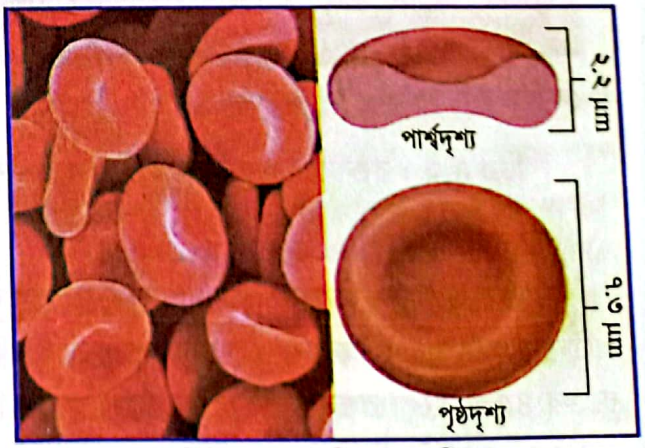

চিত্র ৪.৩ : লোহিত রক্তকণিকা

CamScanner

বৃক্ক এরিথ্রোপয়েটিন ক্ষরণ কমিয়ে দেয়, ফলে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদনও কমে যায়। এরিথ্রোসাইট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **এরিথ্রোপয়েসিস** (erythropoiesis) বলে।

রাসায়নিকভাবে লোহিত কণিকার ৬০-৭০% পানি এবং ৩০-৪০% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় ৯০% **হিমোগ্লোবিন**। অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু **হিম** (heme) নামক লৌহ ধারণকারী **রঞ্জক** (pigment) এবং **গ্লোবিন** (globin) নামক প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ : পুরুষ = 13.5 - 17.5 gm/dL এবং স্ত্রী= 11.5 - 15.5 gm/dL। হিমোগ্লোবিনের চারটি পলিপেপটাইড চেইনের সাথে একটি হিম গ্রুপ যুক্ত থাকে। হিম গ্রুপের জন্যই রক্ত লাল হয়।

চিত্র ৪.৪ : মানুষের রক্তের উপাদান (চিত্রানুগ)

লোহিত কণিকার কাজ : (i) লোহিত কণিকার **হিমোগ্লোবিন** ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 এবং সামান্য পরিমাণ CO_2 পরিবহন করে। (ii) রক্তের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা (viscocity) রক্ষা করে। (iii) এগুলোর হিমোগ্লোবিন ও অন্যান্য অন্তঃকোষীয় বস্তু **বাফাররূপে** রক্তে অম্ল-ক্ষারের সাম্য রক্ষা করে। (iv) প্লাজমাঝিল্লিতে **অ্যান্টিজেন প্রোটিন** সংযুক্ত থাকে যা মানুষের **ব্লাড গ্রুপ** নির্ণয়ে সহায়তা করে। (v) এসব কণিকা রক্তে **বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন** উৎপন্ন করে। (vi) লোহিত রক্তকণিকা এনজাইমরূপী **নাইট্রিক অক্সাইড** উৎপাদন করতে পারে যা এন্ডোথেলিয়াল কোষের *L-arginine*-এর মতো ব্যবহৃত হয়। (vii) এরা **হাইড্রোজেন সালফাইড** গ্যাস উৎপাদন করে যা রক্তনালির সঙ্কোচনের জন্য সংকেত প্রদান করে। (viii) এরা অনেকসময় দেহের অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান (immune response) করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে এক ধরনের মুক্ত আয়ন সৃষ্টি হয় যা জীবাণুর কোষপ্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে একে ধ্বংস করে।

২. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocyte; গ্রিক, leucos = বর্ণহীন, + kytos = কোষ)

মানবদেহের পরিণত শ্বেত কণিকা হিমোগ্লোবিনবিহীন, অনিয়তাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় কোষ। কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না বলে এগুলোকে **শ্বেত রক্তকণিকা** (White Blood Corpuscles, WBC) নামে ডাকা হয় (প্রকৃত পক্ষে বর্ণহীন)। এ রক্তকণিকাকে দেহের **ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক** (mobile defensive unit) বলে কারণ এগুলো **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। মানুষের শ্বেত রক্তকণিকা নির্দিষ্ট আকারবিহীন। প্রয়োজনে আকার পরিবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াস প্রথমে গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্কাকার ও অশ্বক্ষুরাকার ধারণ করে। নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের চাপে একপ্রান্তে অবস্থান নেয়। এগুলো লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে বড়। মানবদেহের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৪-১১ হাজার (গড়ে ৭৫০০) শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে সংখ্যা বেড়ে যায়। লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার গড় অনুপাত আনুমানিক ৬০০ ঃ ১।

CamScanner

নিচের ছবিতে লাল অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে রক্তকণিকার উৎপত্তি দেখানো হলো

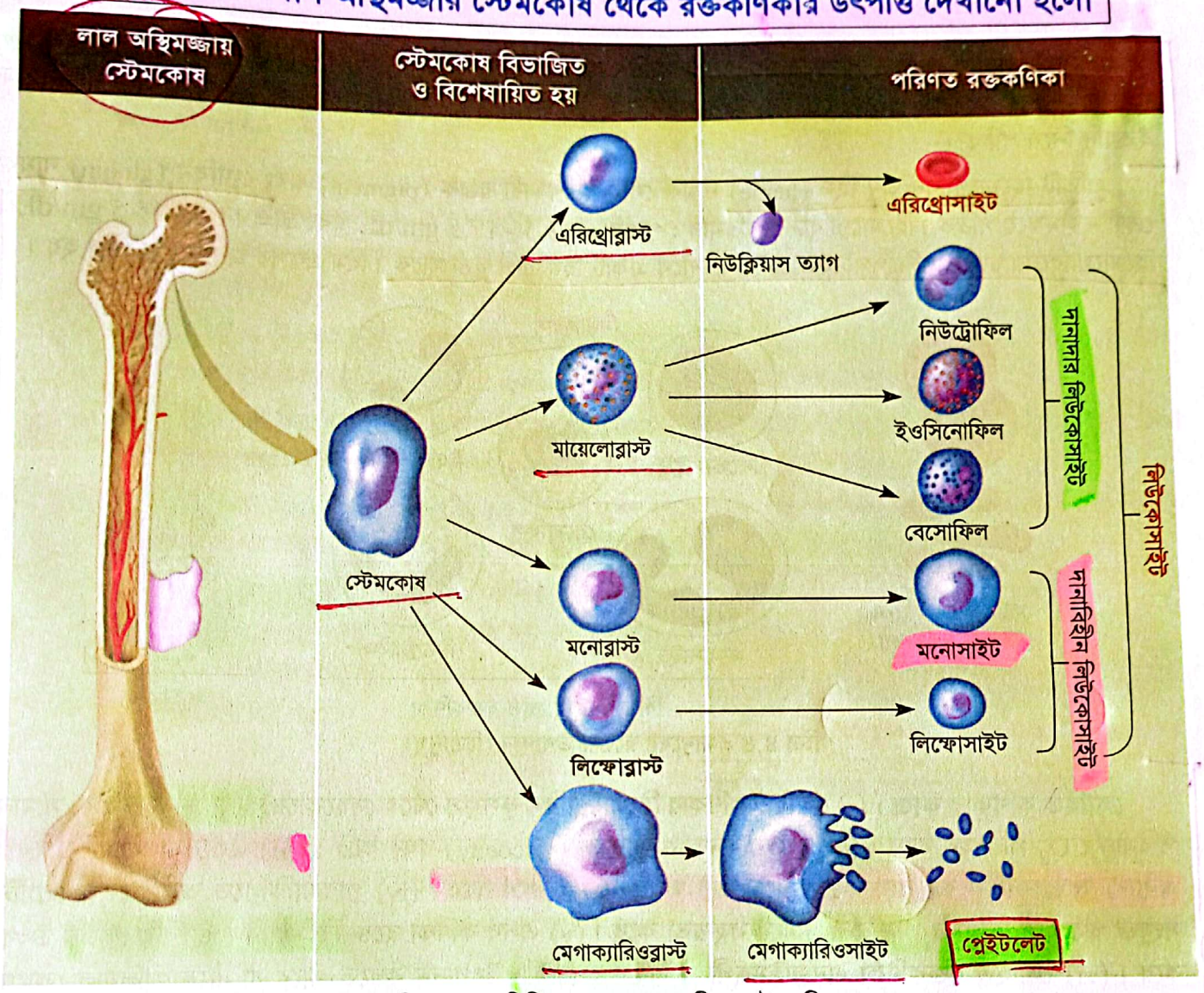

চিত্র ৪.৫ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকার উৎপত্তি

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে তাকে **লিউকোসাইটোসিস** (leukocytosis) এবং কম থাকলে তাকে **লিউকোপেনিয়া** (leukopenia) বলে। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কম থাকলে দুর্বল অনাক্রম্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। **লিউকেমিয়া** (leukemia) বা ব্লাড ক্যানসারের ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিও-প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে।

আকৃতি ও গঠনগতভাবে শ্বেত রক্তকণিকাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-ক. **দানাবিহীন** বা **অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট** (agranulocytes) এবং খ. **দানাদার** বা **গ্র্যানিউলোসাইট** (granulocytes)।

ক. দানাবিহীন বা অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট (Agranulocyte) : এ ধরনের লিউকোসাইটে সাইটোপ্লাজম দানাহীন, স্বচ্ছ এবং নিউক্লিয়াসটি বড় ও অখণ্ডায়িত। এটি আবার নিম্নোক্ত দু'রকম –

CamScanner

i. **মনোসাইট (Monocyte) :** মনোসাইটে অপেক্ষাকৃত ছোট নিউক্লিয়াসটি প্রাথমিক অবস্থায় গোলাকার অথবা ডিম্বাকার থাকে এবং বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কের মতো অথবা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দেখায়। এতে সাইটোপ্লাজম বেশি থাকে। এদের ব্যাস ১২-২০ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুষ্কাল ২-৫ দিন। দেহের ২-৮% শ্বেতকণিকা মনোসাইট। এগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ভক্ষণ করে রোগ আক্রমণ প্রতিহত করে।

ii. **লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) :** লিম্ফোসাইটে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃহৎ আকৃতির গোলাকার, অখণ্ডায়িত একটি নিউক্লিয়াস এবং অপেক্ষাকৃত কম সাইটোপ্লাজম থাকে। এগুলোর ব্যাস ৬-১৬ মাইক্রোমিটার, সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ, দানাবিহীন ও ক্ষারাসক্ত এবং আয়ুষ্কাল প্রায় ৭ দিন। কাজের ধরণ ও এদের কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী লিম্ফোসাইট নিচে বর্ণিত তিন ধরনের।

১. **T কোষ বা T লিম্ফোসাইট :** এরা থাইমাস গ্রন্থির থাইমোসাইটস (thymocytes) থেকে সৃষ্টি হয়। এরা কোষ মাধ্যম অনাক্রম্যতায় (cell-mediated immunity) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. **B কোষ বা B লিম্ফোসাইট :** এরা অস্থিমজ্জার হিমাটোপয়টিক মাতৃকোষ (HSCs) থেকে উৎপন্ন হয়। এরা রক্ত মাধ্যম অনাক্রম্যতায় (humoral immunity) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. **NK কোষ বা Natural Killer Cell :** এরা বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যারা অন্য কোষের জন্য বিষাক্ত এবং অনাক্রম্যতার জন্য বিপদজনক। এরা ভাইরাসের সংক্রমণে দ্রুত সাড়া প্রদান করে।

দেহের ২০-৪০% শ্বেত কণিকা লিম্ফোসাইট। এগুলো লসিকাতন্ত্রে সৃষ্টি হয়। অন্যান্য লিউকোসাইটের মতো এরা ফ্যাগোসাইট নয়।

চিত্র ৪.৬ : বিভিন্ন ধরনের লিউকোসাইট

খ. **দানাদার বা গ্র্যানিউলোসাইট (Granulocytes) :** এ ধরনের লিউকোসাইটে সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত এবং নিউক্লিয়াসটি ছোট ও খণ্ডকযুক্ত। দানাগুলো লিশম্যান রঞ্জকে নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কণিকাগুলোকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

i. **নিউট্রোফিল (Neutrophil) :** সঞ্চালনরত রক্তের ৪০–৬০% হলো নিউট্রোফিল। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম **বর্ণ নিরপেক্ষ** সূক্ষ্ম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৫টি খণ্ডক যুক্ত। এগুলোর ব্যাস ১২-১৫ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুষ্কাল ২-৫ দিন। ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগজীবাণু (ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) ভক্ষণ করে রোগ আক্রমণ প্রতিহত করে। নিউট্রোফিল অ্যামিবয়েড চলনে সক্ষম এবং সঙ্কুচিত হয়ে কৈশিকজালিকা প্রাচীরে কণিকার চেয়ে ছোট ছিদ্র ভেদ করে টিস্যুতে ও সংক্রমণ স্থলে উপস্থিত হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে ডায়াপেডেসিস (diapedesis) বলে।

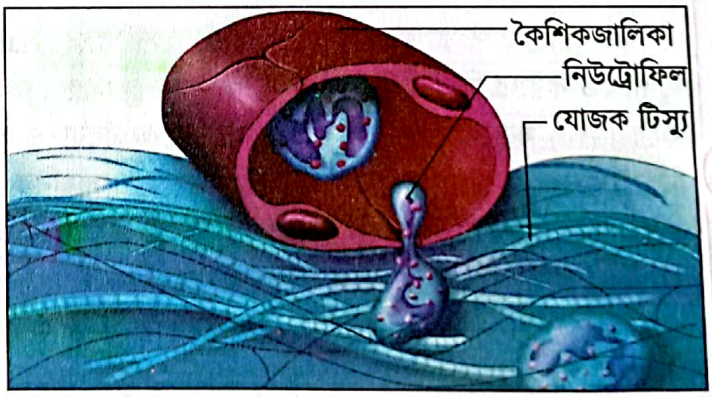

চিত্র ৪.৭ : কৈশিকজালিকা ভেদ করে নিউট্রোফিলের টিস্যুতে প্রবেশ

ii. **ইওসিনোফিল (Eosinophil) :** রক্তের স্বাভাবিক অবস্থায় এদের সংখ্যা ২-৪%। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম দানাময়, অম্লধর্মী। দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণ ধারণ করে। নিউক্লিয়াস সাধারণত ২ খণ্ডকযুক্ত হয়। এদের ব্যাস ১২-১৭ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুষ্কাল ৮–১২ দিন। এরা দেহের অ্যালার্জির বিরুদ্ধে কাজ করে। অ্যালার্জি, পরজীবীর সংক্রমণ, প্লীহা ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগের কারণে রক্তে ইওসিনোফিলের সংখ্যা বেড়ে যায়।

CamScanner

iii. **বেসোফিল (Basophil)** : শ্বেত কণিকার সবচেয়ে কম অংশ (০.৫-১%) বেসোফিল ধরনের। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষারধর্মী। এগুলো ক্ষারাসক্ত হয়ে নীল বর্ণ ধারণ করে। এদের নিউক্লিয়াস দুই খণ্ডক যুক্ত এবং বৃক্কাকার। এদের ব্যাস ১২-১৫ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুষ্কাল ১২–১৫ দিন। বেসোফিল হিস্টামিন (histamine) নিঃসরণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং হেপারিন (heparin) নিঃসরণ করে রক্তকে রক্তনালির মধ্যে জমাট বাঁধতে বাধা প্রদান করে।

শ্বেত রক্তকণিকার কাজ : (i) মনোসাইট ও নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। (ii) লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে (এজন্য এদের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলে)। (iii) বেসোফিল হেপারিন (heparin) উৎপন্ন করে যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে। (iv) দানাদার লিউকোসাইট হিস্টামিন (histamine) সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। (v) নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে। (vi) ইওসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা ধ্বংস করে এবং অ্যালার্জিতে সাড়া দেয়।

৩. অণুচক্রিকা বা প্লেইটলেট (Platelets) বা থ্রম্বোসাইট (Thrombocytes)

দেহের লাল অস্থিমজ্জার মেগাক্যারিওসাইট (megakaryocyte) নামে বড় কোষ থেকে উৎপন্ন ও রক্তরসে ভাসমান ১–৪μm ব্যাসসম্পন্ন, অনিয়তাকার, ঝিল্লি-আবৃত, সামান্য সাইটোপ্লাজমযুক্ত কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন, কোষ-ভগ্নাংশকে (cell fragments) **অণুচক্রিকা বা প্লেইটলেট** বলে। প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে প্রায় ১,৫০,০০০–৪,০০,০০০ অণুচক্রিকা থাকতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ২০০ বিলিয়ন (২০ হাজার কোটি) অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। রক্তস্রোতে প্রবেশের পর এদের জীবনকাল ৫-৯ দিন। যকৃত ও প্লীহার ম্যাক্রোফেজের মাধ্যমে এদের ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে।

চিত্র ৪.৮ : অণুচক্রিকা

অণুচক্রিকার ঝিল্লিতে অবস্থিত গ্লাইকোপ্রোটিন রক্তবাহিকার ক্ষতস্থানে বিশেষ করে এন্ডোথেলিয়ামে যুক্ত হয় এবং ঝিল্লি থেকে বিপুল পরিমাণ ফসফোলিপিড নির্গত হয়ে রক্ত জমাটের বিভিন্ন ধাপ ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়।

অণুচক্রিকার কাজ : (i) অস্থায়ী প্লেইটলেট প্লাগ (platelet plug) সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে। (ii) রক্তজমাট ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ক্লটিং ফ্যাক্টর (clotting factor) ক্ষরণ করে। (iii) প্রয়োজন শেষে রক্তজমাট বিগলনে সাহায্য করে। (iv) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংস করে। (v) দেহের কোথাও ব্যথার সৃষ্টি হলে নিউট্রোফিল ও মনোসাইটকে আকৃষ্ট করতে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। (vi) রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়ামের অন্তঃপ্রাচীর সুরক্ষার জন্য গ্রোথ-ফ্যাক্টর ক্ষরণ করে। (vii) সেরোটোনিন (serotonin) নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশে রক্তবাহিকাকে দ্রুত সঙ্কোচনে উদ্বুদ্ধ করে। (viii) স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি অণুচক্রিকা থাকলে রক্তনালির ভিতরে অদরকারী রক্তজমাট সৃষ্টি, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

রক্ত কণিকাগুলোকে রক্তকোষ বলা হয় না। কারণ–

লোহিত কণিকার অধিকাংশ রক্ত কণিকায় প্রয়োজনীয় কোষঅঙ্গাণু থাকে না, যেমন– নিউক্লিয়াস, সেন্ট্রিওল, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বডি ইত্যাদি কোষীয় অঙ্গাণু নেই। শ্বেতকণিকা ও অণুচক্রিকাতেও অনেক কোষীয় অঙ্গাণু অনুপস্থিত থাকে। তাছাড়া রক্ত কণিকাগুলো বিভাজিত হয়ে নতুন রক্ত কণিকা তৈরি করতে পারে না। এগুলো মূলত অস্থি মজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং ঘন সংবদ্ধ হয়ে অভিন্ন স্তর সৃষ্টির পরিবর্তে তরল মাতৃকায় ভেসে বেড়ায়। তাই রক্ত কণিকাগুলোকে রক্তকোষ বলা হয় না।

CamScanner

মানবদেহের রক্তের বিভিন্ন রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

রক্তকণিকা	প্রকারভেদ	সংখ্যা (প্রতি ঘন মিমি রক্তে)	উৎসস্থল	গঠন বৈশিষ্ট্য	কাজ	আয়ুষ্কাল
লোহিত রক্তকণিকা	–	পুরুষে ৫০ লক্ষ স্ত্রীতে ৪৫ লক্ষ	ভ্রূণাবস্থায় যকৃত ও প্লীহা এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জা।	গোলাকার, দ্বি-অবতল, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিউক্লিয়াস বিহীন; গড় ব্যাস ৭.৩μm ও স্থূলতা ২.২μm.	(i) O_2 ও CO_2 বহন করা। (ii) অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করা।	১২০ দিন
শ্বেত রক্তকণিকা	(i) মনোসাইট	৩০০-৮০০	প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, বৃক্কাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ১২μm-২০μm.	ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে।	২-৫ দিন
	(ii) লিম্ফোসাইট	১৫০০-২৭০০	প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, প্রায় গোলাকার, বৃহদাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ৬μm-১৬μm.	অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।	প্রায় ৭ দিন
	(iii) নিউট্রোফিল	৩-৫ হাজার	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৫ খন্ড বিশিষ্ট। ব্যাস ১২μm-১৫μm.	ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করা।	২-৫ দিন
	(iv) ইওসিনোফিল	১৫০-৪০০	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৭ খন্ড বিশিষ্ট। ব্যাস ১২μm-১৭μm.	অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে। কৃমির লার্ভা ধ্বংস করে।	৮-১২ দিন
	(v) বেসোফিল	২৫ – ২০০	লাল অস্থিমজ্জা	দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস বৃক্কাকার। ব্যাস ১২μm-১৫μm.	হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্ত বাহিকার ভিতর জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয়। হিস্টামিন ক্ষরণ করে।	১২-১৫ দিন
অণুচক্রিকা	–	১.৫ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ	লাল অস্থিমজ্জা	গোল, ডিম্বাকার বা রডের মতো, দানাময় কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। ১μm-৪μm ব্যাসবিশিষ্ট।	রক্তজমাটে সহায়তা করে।	৫-৯ দিন।

লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা	অণুচক্রিকা
সংখ্যা	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৪৫-৫০ লক্ষ।	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৪-১১ হাজার।	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ১.৫ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ।
নিউক্লিয়াস	২. প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়াস থাকলেও হিমোগ্লোবিন সঞ্চিত হবার পর নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয়ে যায়।	২. সব সময় নিউক্লিয়াস থাকে।	২. কোনো সময়ই নিউক্লিয়াস থাকে না।
বর্ণ	৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন থাকায় এগুলোকে লাল বর্ণের দেখায়।	৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন না থাকায় এগুলো বর্ণহীন।	৩. বর্ণহীন।
আয়ুষ্কাল	৪. ১২০ দিন।	৪. ২-১৫ দিন।	৪. ৫-৯ দিন।
আকৃতি	৫. দ্বি-অবতল, চাকতির মতো।	৫. গোলাকার বা অনিয়ত।	৫. অনিয়ত আকৃতির।
কাজ	৬. O_2 পরিবহন।	৬. রোগ প্রতিরোধ।	৬. রক্ত তঞ্চন।

CamScanner

রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন (Blood Clotting)

মানবদেহে রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারেনা কারণ বাহিকার অন্তঃস্থ প্রাচীর থাকে মসৃণ এবং রক্তে **হেপারিন** (heparin) নামে এক ধরনের মিউকোপলিস্যাকারাইডের সংবহন। দেহের কোথাও ক্ষত সৃষ্টির ফলে কোনো রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশে ও সংক্রমণ প্রতিরোধে যে জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় **ফাইব্রিন জালক** সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতস্থানে রক্তকে থকথকে পিণ্ডে পরিণত করে সে প্রক্রিয়াকে **রক্তের জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় অণুচক্রিকা ও রক্তরসে উপস্থিত ১৩ ধরনের **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (clotting factor) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ফ্যাক্টর হলো– (i) ফাইব্রিনোজেন, (ii) প্রোথ্রম্বিন, (iii) থ্রম্বোপ্লাস্টিন ও (iv) Ca^{2+}।

নিচে ফ্যাক্টরগুলোর নাম ও রক্ত তঞ্চনে ভূমিকা উল্লেখ করা হলো

ফ্যাক্টর	তঞ্চনে ভূমিকা
১. ফ্যাক্টর-I বা ফাইব্রিনোজেন	এটি গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন। তঞ্চনের সময় ফাইব্রিনে পরিণত হয়।
২. ফ্যাক্টর-II বা প্রোথ্রম্বিন	এটি প্লাজমা প্রোটিন। ভিটামিন K-র উপস্থিতিতে যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। তঞ্চনের সময়ে থ্রম্বিনে পরিণত হয়।
৩. ফ্যাক্টর-III বা থ্রম্বোপ্লাস্টিন	এটি বিনষ্ট টিস্যুকোষ বা ভাঙা অণুচক্রিকা থেকে নিঃসৃত হয়। এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে।
৪. ফ্যাক্টর-IV বা ক্যালসিয়াম	ক্যালসিয়াম আয়ন একাধারে থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে এবং অপর-দিকে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে।
৫. ফ্যাক্টর-V বা ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বা প্রোঅ্যাকসেলারিন	প্লাজমায় অবস্থিত প্রোটিন জাতীয় এ পদার্থটি প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে।
৬. ফ্যাক্টর-VI বা অ্যাকসেলারিন	এটি প্রকল্পিত।
৭. ফ্যাক্টর-VII বা স্টেবল ফ্যাক্টর বা প্রোকনভারটিন	প্লাজমায় অবস্থিত এ প্রোটিনটি থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।
৮. ফ্যাক্টর-VIII বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (AHF)	এটি প্লাজমায় থাকে এবং থ্রম্বোপ্লাস্টিন সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
৯. ফ্যাক্টর-IX বা ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর	এটি প্লাজমায় থাকে এবং থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।
১০. ফ্যাক্টর-X বা স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর	এর রাসায়নিক উপাদান ফ্যাক্টর -VII এর মতো। এর অভাবে রক্ত তঞ্চন ব্যাহত হয়।
১১. ফ্যাক্টর-XI বা প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন	রক্তরসে অবস্থিত প্রোটিন, থ্রম্বোপ্লাস্টিন গঠনে অংশ নেয়।
১২. ফ্যাক্টর-XII বা হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর	রক্তরসে অবস্থিত এ ফ্যাক্টর ক্যালিক্রেইনকে (Kallikrein) সক্রিয় করে এবং প্লাজমাকাইনিন (Plasmakinin) নামক পদার্থ সৃষ্টি করে রক্তনালির ভেদ্যতা ও সম্প্রসারণশীলতা বাড়ায়।
১৩. ফ্যাক্টর-XIII বা ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর	এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহযোগিতায় রক্তের নরম তঞ্চন পিণ্ডকে অদ্রবণীয় কঠিন তন্তুতে রূপান্তরিত করে।

রক্ত তঞ্চন পদ্ধতি (Mechanism of Blood Clotting)

দেহের শারীরবৃত্তিক স্থিতাবস্থার জন্য রক্তবাহিকায় রক্তরস, রক্তকণিকা ইত্যাদির নির্বিঘ্ন প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে রক্তের জমাট বাঁধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষত নিরাময়ের উদ্দেশে যে কোনো উপায়ে রক্তপাত মন্থর ও বন্ধের প্রক্রিয়াকে **হিমোস্ট্যাসিস** (hemostasis) বলে।

CamScanner

নিচে বর্ণিত কয়েকটি ধারাবাহিক জৈব রাসায়নিক ধাপের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১. দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে বা বিনষ্ট হলে সে স্থানের টিস্যু থেকে রক্ত বেরিয়ে যখন বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন **হেপারিন নিষ্ক্রিয় হয়**, থ্রম্বোসাইট (অণুচক্রিকা) বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** (thromboplastin; এক ধরনের লিপোপ্রোটিন) নামক এনজাইম বেরিয়ে রক্তরসে চলে আসে।

২. থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তরসের ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) এবং ফ্যাক্টর VII, VIII, IX ও X-এর সহায়তায় রক্তরসের নিষ্ক্রিয় **প্রোথ্রম্বিন** (prothrombin) এনজাইমকে সক্রিয় **থ্রম্বিন** (thrombin)-এ পরিণত করে।

৩. সক্রিয় থ্রম্বিন রক্তরসের **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen) প্রোটিনকে প্রথমে চিকন সুতার মতো **ফাইব্রিন মনোমার** (fibrin monomer)-এ পরিণত করে। ফাইব্রিন সূত্রকগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে জালকের মতো **ফাইব্রিন পলিমার** (fibrin polymer) গঠন করে। একে রক্ত জমাট বাঁধানোর কাঠামো/কঙ্কাল বলে। ফ্যাক্টর XIII ফাইব্রিন জালক সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে।

৪. ফাইব্রিন জালকের মধ্য দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়ার সময় লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, রক্তের তরল অংশ এবং অন্যান্য উপাদান আটকে যায়। ফলে রক্ত জমাট বাঁধে, আর রক্তক্ষরণ হয় না। লোহিত কণিকা আটকে যাওয়ায় জমাটটি **লালচে** দেখায়।

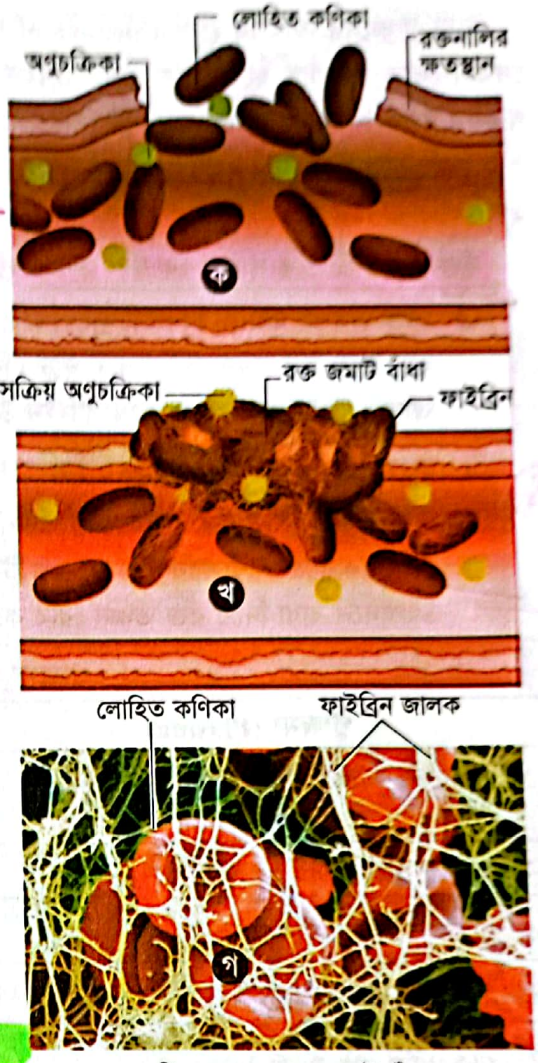

চিত্র ৪.৯ : রক্ত জমাট বাঁধা

জমাট বাঁধা শেষ হলে জমাট থেকে যে হলুদ তরল বেরিয়ে আসে তা **সিরাম** (serum)। সিরামের উপাদান রক্তরসের মতোই তবে এতে ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন, ফ্যাক্টর-V ও ফ্যাক্টর-VIII থাকে না। কারণ সেগুলো রক্ত তঞ্চনে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সিরামে **সেরোটনিন** বেশি থাকে। কারণ অণুচক্রিকাতে সেরোটিন থাকে। অণুচক্রিকা ভেঙ্গে যাওয়ায় সেরোটনিন সিরামে চলে আসে। ফাইব্রিন জমাট সাময়িক। রক্তবাহিকার পুনর্গঠন শুরু হলে নতুন টিস্যুকোষ সৃষ্টির জন্য **প্লাজমিন** (plasmin) এনজাইম ফাইব্রিন জালককে ধ্বংস করে দেয়।

ধাপ-১ বিনষ্ট অণুচক্রিকা ও টিস্যুকোষজাত উপাদান —রক্তরসের তঞ্চন সহায়ক উপাদান→ থ্রম্বোপ্লাস্টিন

ধাপ-২ প্রোথ্রম্বিন (নিষ্ক্রিয়) —থ্রম্বোপ্লাস্টিন→ থ্রম্বিন (সক্রিয়)

ধাপ-৩ ফাইব্রিনোজেন —থ্রম্বিন→ ফাইব্রিন মনোমার

ধাপ-৪ ফাইব্রিন জালক —পরস্পরের সাথে সংযোজন→ ফাইব্রিন পলিমার

রক্তকণিকা আবদ্ধকরণ ↓

তঞ্চন পিণ্ড (রক্ত জমাট বাঁধা)

চিত্র ৪.১০ : রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সার

রক্ততঞ্চনকাল : দেহ থেকে নির্গত রক্ত জমাট বাঁধতে যে সময় লাগে তাকে **রক্ততঞ্চনকাল** বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্ততঞ্চনকাল হচ্ছে ৪-৫ মিনিট।

রক্ত তঞ্চন ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতিতে কিংবা স্বল্প মাত্রায় উপস্থিতির কারণে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। যেমন ফ্যাক্টর VIII ও IX এর অভাবে বা ত্রুটির জন্য থ্রম্বোপ্লাস্টিন অকার্যকর থাকে। ফলে যে কোনো ছোট ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়। একে **হিমোফিলিয়া** (haemophilia) রোগ বলে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এ রোগ ছিল এবং তাঁর মাধ্যমে রাজ পরিবারে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে।

CamScanner

রক্ত তঞ্চনের তাৎপর্য (Significance of Blood Clotting) : দেহের কোনো অংশের রক্তবাহিকা কেটে গেলে সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে এবং সংবহনতন্ত্রে রক্তের আয়তন কমে যায়। রক্ত প্রাণিদেহে খাদ্যবস্তুর সরবরাহ, গ্যাসীয় বস্তুর পরিবহন, রেচন বস্তুর অপসারণ, হরমোন বহন এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই দেহে রক্তের পরিমাণ কমে গেলে নানারকম শারীরবৃত্তীয় সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি প্রাণীর মৃত্যুও হতে পারে। রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া ছিন্ন রক্তবাহিকা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে সেই সব সম্ভাবনা রোধ করে।

রক্তনালির ভিতরে সাধারণত রক্ত তঞ্চন হয় না। কারণ–

- রক্ত অমসৃণ তল বা বিনষ্ট টিস্যুকোষ বা বাতাসের সংস্পর্শে এলে রক্তের অণুচক্রিকা ভেঙ্গে থ্রম্বোপ্লাস্টিন তৈরি হয়, ফলে রক্ত তঞ্চনের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু রক্তনালির অন্তর্গাত্র মসৃণ হওয়ায় এবং রক্ত বাতাসের সংস্পর্শে না আসায় অণুচক্রিকা থেকে থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপন্ন হয় না, ফলে রক্ত তঞ্চনের সূত্রপাতও ঘটেনা।
- রক্তনালির ভিতর রক্তের গতি বেশি থাকে যা রক্ত তঞ্চনের সহায়ক নয়।
- রক্তে **হেপারিন** নামক একধরনের তঞ্চন নিরোধক পদার্থ বা **অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট** (anticoagulant) থাকে। হেপারিন রক্তের বেসোফিল ও যোজক টিস্যুর মাস্টকোষ থেকে নিঃসৃত হয়। হেপারিন প্রোথ্রম্বিন থেকে থ্রম্বিনের উৎপাদনে বাধা দিয়ে রক্ত তঞ্চন রোধ করে।

প্লাজমা ও সিরামের মধ্যে পার্থক্য

প্লাজমা (Plasma)	সিরাম (Serum)
১. স্বাভাবিক রক্তের জলীয় অংশকে প্লাজমা বলে।	১. তঞ্চিত রক্তের তঞ্চন পিণ্ড থেকে নিঃসৃত জলীয় অংশকে সিরাম বলে।
২. এতে বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকা থাকে।	২. এতে রক্তকণিকা থাকে না।
৩. এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে।	৩. এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে না।
৪. এর তঞ্চন ধর্ম উপস্থিত।	৪. এর তঞ্চন ধর্ম অনুপস্থিত।
৫. সেরোটনিন কম থাকে।	৫. সেরোটনিন বেশি থাকে।

লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

টিস্যু গঠনকারী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত বর্ণহীন তরল পদার্থকে লসিকা (lymph; ল্যাটিন, *lympha* = clear water) **বলে**। পরিণত মানবদেহে প্রতিদিন কৈশিকজালিকার প্রাচীর ভেদ করে ৪-৮ লিটার তরল পদার্থ ও রক্তপ্রোটিন চারপাশের টিস্যুকোষের ফাঁকে ফাঁকে লসিকা হিসেবে অবস্থান করে। লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে শুধু লসিকা নয় রক্তপ্রোটিনও রক্তে ফিরে যায়। রক্তপ্রোটিন যদি এভাবে পুনরুদ্ধার না হতো তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মারা যেতো।

লসিকার উৎপত্তি : ধমনির শাখা থেকে উৎপন্ন কৈশিক-ধমনিতে (arteriole) রক্ত পৌঁছালে এর অধিকাংশই কৈশিক-শিরাতে (venule) প্রবাহিত হয়। প্রায় ১০% এর মতো রক্তরস (প্লাজমা) কৈশিকজালিকা থেকে বেরিয়ে দেহ কোষের চারদিকে **ইন্টারস্টিশিয়াল তরল** (interstitial fluid) হিসেবে অবস্থান করে। এ তরল লসিকা নালিকায় প্রবেশ করে লসিকায় পরিণত হয়। লসিকা উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **লিম্ফোজেনেসিস** (lymphogenesis) বলে।

লসিকার উপাদান : লসিকায় প্রধানত দুধরনের উপাদান দেখা যায়, যথা–**কোষ উপাদান** ও **কোষবিহীন উপাদান**।

কোষ উপাদান : লসিকায় প্রধানত শ্বেত কণিকার **লিম্ফোসাইট** এবং কিছু **মনোসাইট** থাকে। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার লসিকায় ৫০০–৭৫,০০০ লিম্ফোসাইট থাকতে পারে।

CamScanner

কোষবিহীন উপাদান : লসিকায় অবস্থিত কোষবিহীন উপাদানগুলো রক্তরসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লসিকায় প্রায় ৯৪%ই পানি এবং ৬% কঠিন পদার্থ বিদ্যমান। কঠিন অংশের মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো পাওয়া যায় :

১. **প্রোটিন :** লসিকায় প্রধানত অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি থাকে।

২. **লিপিড :** প্রধানত কাইলোমাইক্রন হিসেবে থাকে যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড উপস্থিত। অভুক্ত অবস্থায় লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে কাইল (chyle) বলে। তবে সাধারণত এর পরিমাণ মোট কঠিন অংশের প্রায় ৫–১৫%।

৩. **খনিজ :** সোডিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, বাই-কার্বোনেট ইত্যাদির আয়ন পাওয়া যায়।

৪. **রেচন বর্জ্য :** লসিকায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

৫. **অন্যান্য বস্তু :** গ্লুকোজ, জীবাণু, ক্যানসার কোষ, দ্রবীভূত CO_2 ইত্যাদিও লসিকায় পাওয়া যায়।

লসিকার কাজ

দেহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন–

১. **প্রোটিন পরিবহন :** টিস্যুর ফাঁকা স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।

২. **স্নেহ পরিবহন :** যেসব স্নেহকণা ও উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট কণা কৈশিকনালির বাধা অতিক্রমে অক্ষম সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

৩. **O_2 ও পুষ্টি :** দেহের যেসব টিস্যুকোষে রক্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয় না সেখানে লসিকা অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে।

৪. **শোষণ :** অন্ত্র থেকে স্নেহপদার্থ শোষিত হয়ে লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

৫. **প্রতিরক্ষা :** লসিকায় উপস্থিত শ্বেত কণিকা (লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট) দেহের প্রতিরক্ষায় অবদান রাখে।

৬. **প্রতিরোধ :** লসিকা ও লিম্ফোসাইট থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৭. **দেহরসের পুনর্বন্টন :** লসিকা রক্ত সংবহনের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তরল পদার্থ পরিবহনের মাধ্যমে দেহরসের পুনর্বন্টনে অংশ নেয়।

৮. **টিস্যুর গাঠনিক অখণ্ডতা রক্ষণ :** বিভিন্ন অঙ্গে টিস্যুর সাংগঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় লসিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৯. **টিস্যুরসের নিষ্কাশন :** টিস্যু থেকে টিস্যুরসের প্রায় ১০% অংশ লসিকার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

১০. **CO_2 ও বর্জ্যপদার্থের নির্গমন :** অপ্রয়োজনীয় CO_2 ও বর্জ্যপদার্থ কোষ থেকে লসিকায় গৃহীত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়।

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System)

লসিকানালি ও লসিকাগ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেহে লসিকারস প্রবাহিত হয় তাকে লসিকাতন্ত্র বলে। ডেনিস বিজ্ঞানী Olaus Rudbeck এবং Thomas Bartholin, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম মানুষের লসিকাতন্ত্রের বিবরণ দেন। রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং লসিকাতন্ত্র উভয়েই সমগ্র দেহে ফ্লুইড (fluid) সংবহন করে বলে লসিকাতন্ত্রকে কখনো কখনো দ্বিতীয় সংবহনতন্ত্র বলেও অভিহিত করা হয়। লসিকাতন্ত্র প্রধান দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা– লসিকানালি ও লসিকাগ্রন্থি। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. লসিকানালি (Lymph Vessels)

লসিকানালি বদ্ধপ্রান্তবিশিষ্ট সূক্ষ্ম নালিকা। লসিকানালি দুধরনের, যথা–

১. **অন্তর্মুখী লসিকানালি :** এসব নালির মাধ্যমে লসিকা লসিকাগ্রন্থির দিকে পরিবাহিত হয়।

২. **বহির্মুখী লসিকানালি :** এসব লসিকানালির মাধ্যমে লসিকাগ্রন্থি থেকে লসিকা রস অন্যত্র পরিবাহিত হয়।

মানুষের দেহের সকল লসিকানালি প্রধানত দুটি নালিতে মিলিত হয়। যথা:-

১. **ডান লসিকানালি :** মাথা ও গলার ডান দিক, ডান বাহু এবং বক্ষ অঞ্চলের ডান দিকে অবস্থিত লসিকানালিগুলো মিলে ডান লসিকানালি গঠন করে। এটি ডান সাবক্লেভিয়ান শিরা এবং ডান অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত।

CamScanner

২. থোরাসিক লসিকানালি : দেহের নিম্নাংশ এবং বাম দিকের লসিকানালিগুলো মিলে **থোরাসিক লসিকানালি** গঠন করে। এটি **বাম সাবক্লেভিয়ান ও বাম অন্তঃজুগুলার** শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত। পৌষ্টিকনালি অঞ্চলে লসিকানালি সুবিকশিত এবং নালি অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম লসিকানালিকে **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) বলে। লসিকানালিতে শিরার অনুরূপ **কপাটিকা** থাকে তবে সংখ্যায় বেশি। ফলে লসিকা শুধু এক দিকে প্রবাহিত হয়। চলন বা শ্বসনের সময় কঙ্কাল পেশির সঙ্কোচনে লসিকানালিতে অত্যন্ত ধীর গতিতে লসিকা প্রবাহিত হয়। লসিকানালিতে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বা কোষের ধ্বংসাবশেষ (cell debris) প্রবেশ করতে পারে।

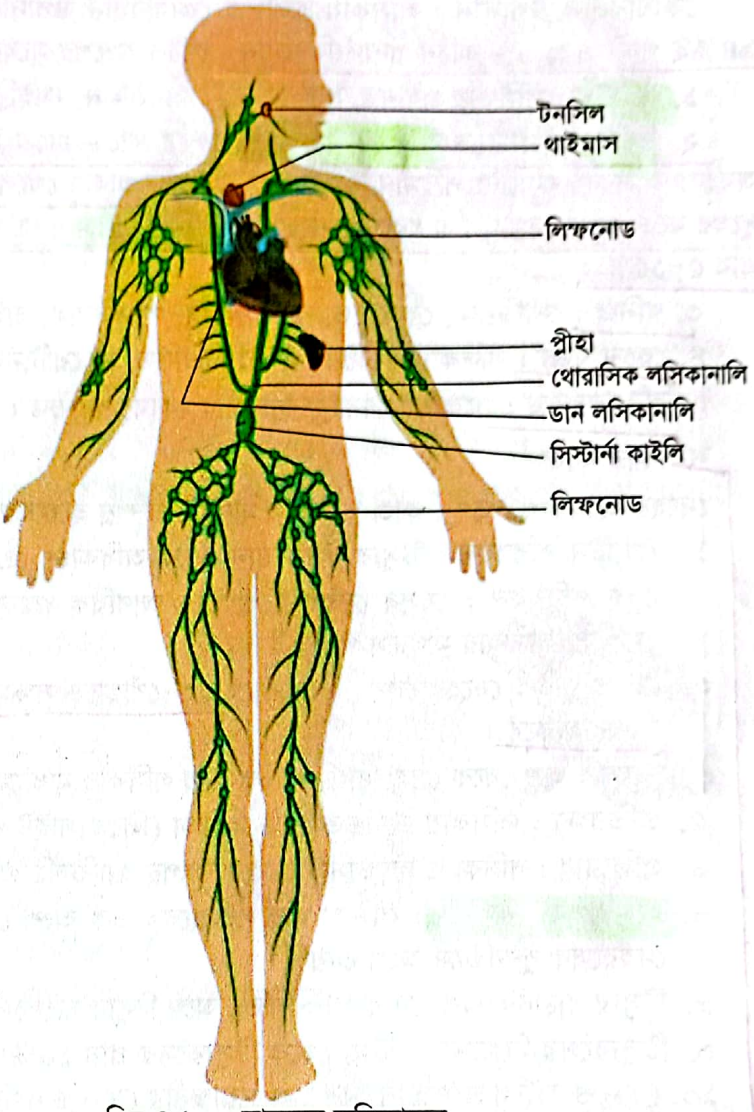

চিত্র ৪.১০ : মানুষের লসিকাতন্ত্র

খ. লসিকাগ্রন্থি (Lymph Glands)

মানবদেহে **পাঁচ** ধরনের লসিকাগ্রন্থি পাওয়া যায়– **লিম্ফনোড, টনসিল, প্লীহা, থাইমাস ও লাল অস্থিমজ্জা**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

লিম্ফনোড (Lymph Node)

লিম্ফনোড হচ্ছে লসিকা বাহিকায় অবস্থিত ক্যাপসুলের মতো অংশ। এগুলো শ্বেত রক্তকণিকা বিশেষ করে ম্যাক্রোফেজ ও লিম্ফোসাইটে পূর্ণ থাকে এবং লসিকা থেকে অণুজীব ও বহিরাগত পদার্থ অপসারণ করে। লসিকা যখন রক্ত সংবহনতন্ত্রে ফিরে যায় তখন তা লিম্ফনোডে পরিস্রুত হয়। নোডগুলো যখন লসিকা পরিষ্কারে সক্রিয় থাকে তখন এর ভিতরে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এবং নোড নিজেও ফুলে-ফেঁপে উঠে। **মানবদেহে প্রায় ৪০০ – ৭০০ লিম্ফনোড পাওয়া যায়।**

টনসিল (Tonsils)

মানবদেহে **তিন** ধরনের **টনসিল** রয়েছে– **প্যালাটাইন, অ্যাডেনয়েড** (বা ফ্যারিঞ্জিয়াল) ও **লিঙ্গুয়াল** টনসিল। আমরা সাধারণতভাবে টনসিল বলতে প্রধানত **প্যালেটাইন** টনসিলকে বুঝি। মুখবিবরের পিছনে অর্থাৎ গলার প্রান্তে দুপাশে উদ্গত একটি করে ডিম্বাকার, কোমল টিস্যুনির্মিত, ছোট ছোট গর্তযুক্ত ও ফ্যাকাসে লালচে রঙের মিউকোসায় আবৃত লিম্ফ অঙ্গকে **টনসিল** বলে। অনেক সময় অণুজীব (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি) দমন করতে গিয়ে টনসিল নিজেই আক্রান্ত হয় কিংবা অতিরিক্ত ময়লায় ছিদ্রগুলো বন্ধ হলে টনসিলে সৃষ্ট প্রদাহকে **টনসিলাইটিস** (tonsillitis) বলে। এ টনসিলের কাজ হচ্ছে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে লসিকায় প্রবেশিত বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে শ্বসন ও পরিপাকতন্ত্রের সুরক্ষা দেয়।

CamScanner

কোনো কোনো মানুষ, বিশেষ করে অনেক শিশু ঘন ঘন টনসিলাইটিসে আক্রান্ত হয়। ঝামেলামুক্ত হওয়ার জন্য ব্যক্তি বা অভিভাবকেরা অপারেশনের মাধ্যমে টনসিল অপসারণকেই সঠিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করেন। অপারেশন করে টনসিল অপসারণকে **টনসিলেকটমি** (tonsillectomy) বলে। দেহের প্রতিরক্ষায় টনসিলের ভূমিকা উপলব্ধির পর বর্তমানে এ প্রক্রিয়া যথেষ্ট কমেছে।

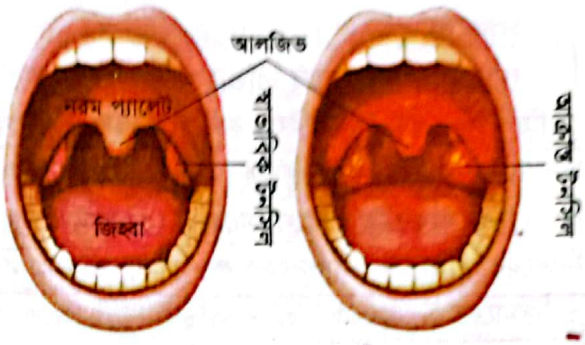

চিত্র ৪.১১ : টনসিল; বায়ে-স্বাভাবিক ও ডানে আক্রান্ত

প্লীহা বা পীলা (Spleen)

পাকস্থলির পিছনে উদরীয় গহ্বরের উর্ধ্ব বাঁপাশে মধ্যচ্ছদার ঠিক নিচে অবস্থিত হালকা বেগুনি রংয়ের একটি ডিম্বাকার, প্রায় ১৩ x ৭ x ৩ সে.মি. ঘন আয়তন (মুষ্টির মতো) ও ১৭০ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট অঙ্গটি **প্লীহা**। এটি দুধরনের **প্লীহামজ্জা** (spleen pulp) নিয়ে গঠিত-একটি লাল, অন্যটি সাদা মজ্জা। সমগ্র গড়নটি অপেক্ষাকৃত পাতলা বহিঃস্থ ক্যাপসুলে আবৃত থাকে।

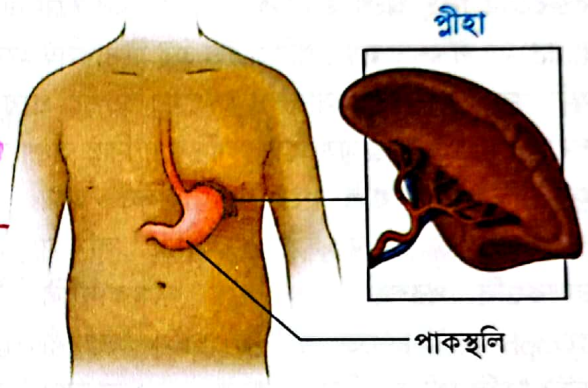

চিত্র ৪.১২ : প্লীহার অবস্থান ও গঠন

প্লীহাকে **রক্তের রিজার্ভার বা ব্লাড ব্যাংক** বলা হয় এবং এটি প্রায় ৩০০ মিলিলিটার রক্ত জমা রাখে। প্লীহা রক্তের প্রধান ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ লোহিত রক্তকণিকা প্লীহায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে একে **লোহিত রক্তকণিকার কবরস্থান** বলা হয়। এটি জীবাণু ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করে।

প্লীহার বহিঃস্থ ক্যাপসুল অপেক্ষাকৃত পাতলা বলে সংক্রমণ বা আঘাতে ফেটে যায়। তখন প্লীহার কাজ অন্যান্য অঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন হলেও প্লীহাবিহীন দেহে প্রায়ই সংক্রমণের আশংকা থাকে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়।

থাইমাস (Thymus)

বক্ষগহ্বরে শ্বাসনালি ও উরঃফলকের (sternum) মাঝে হৃৎপিণ্ডের উপরে অবস্থিত পিরামিড আকৃতির নরম, দ্বিখন্ডিত লিম্ফয়েড অঙ্গের নাম **থাইমাস**। শিশুদেহে এটি বড় ও সক্রিয় থাকে। এ সময় থাইমাস থেকে দুধরনের হরমোন ক্ষরিত হয়: **থাইমোসিন** ও **থাইমোপোয়েটিন**। এগুলো লিম্ফনোডে লিম্ফোসাইটের পরিপক্কতা নিয়ন্ত্রণ করে। বয়ঃসন্ধিকালে এটি ক্রমশঃ ফ্যাটটিস্যুতে পরিণত হয়। আর প্রাপ্তবয়স্কে সংক্ষিপ্ত বা অদৃশ্য হয়ে যায়। লাল অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন শ্বেত রক্তকণিকা রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে থাইমাসে পৌঁছে পরিপক্ক হয়। পরিপক্ক কোষগুলোকে **T-কোষ** বা **T-লিম্ফোসাইট** বলে। এসব কোষ থাইমাস থেকে সারাদেহে বন্টিত হয়ে অবশেষে লিম্ফনোডে স্থায়ী হয়। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্বেত রক্তকণিকাপুঞ্জ যা সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতায় সমন্বয় ঘটিয়ে দায়িত্ব পালন করে। বহিরাগত যেকোনো জীবাণুর (ভাইরাস/ ব্যাকটেরিয়া) শনাক্তকরণ ও বিনাশে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন প্রতিরোধী কোষে পরিণত হয়ে (T-ইফেক্টার, T-কিলার, T-হেলপার কোষ প্রভৃতি) নানা কৌশলে দেহকে সুস্থ রাখে। প্রাপ্তবয়স্ক দেহে থাইমাস সংক্ষিপ্ত বা অদৃশ্য হলেও আগের লিম্ফোসাইট থেকে সৃষ্ট কোষগুলো লসিকাতন্ত্রে আজীবন সক্রিয় থাকে।

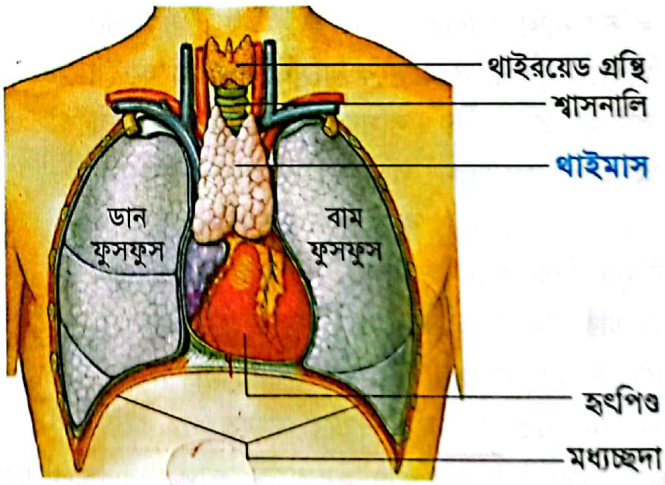

চিত্র ৪.১৩ : থাইমাসের অবস্থান ও গঠন

CamScanner

লাল অস্থিমজ্জা (Red Bone Marrow)

লাল অস্থিমজ্জা হচ্ছে বিভিন্ন অস্থির ভিতর অবস্থিত স্পঞ্জের মতো, অর্ধকঠিন ও লাল টিস্যু। লাল অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা এবং প্লেইটলেট উৎপন্ন হয়। এখানে স্টেমকোষ আজীবন বিভক্ত হয়ে লিম্ফোসাইটসহ সবধরনের রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। প্রতিরক্ষা কোষগুলো রক্তপ্রবাহে মুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গে ও টিস্যুতে পরিযায়ী হয়ে পরিণত হয়। শিশুদেহের অধিকাংশ হাড়ে লাল অস্থিমজ্জা পাওয়া যায়। প্রাপ্তবয়স্কে এ মজ্জার অবস্থান সীমিত হয়ে পড়ে কেবল নিতম্বের পেলভিস, মেরুদণ্ডের কশেরুকা, স্টার্নাম বা উরঃফলক, করোটি, ক্ল্যাভিকল বা কণ্ঠাস্থি, পর্শুকা এবং হিউমেরাস ও ফিমারের উর্ধ্বপ্রান্তে। এসব অস্থির নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া বাকি অংশ ফ্যাটটিস্যুতে পরিণত হয়।

লসিকা সংবহন (Circulation of Lymph)

রক্ত সরাসরি ধমনির মাধ্যমে টিস্যুকোষে পৌঁছাতে পারে না। ধমনি ক্রমাগত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে **রক্তজালক বা কৈশিকজালিকা** (blood capillaries) গঠন করে। এ জালক পূনরায় পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে উপশিরা, শাখাশিরা এবং প্রধান শিরায় পরিণত হয়। রক্তজালকের মধ্য দিয়ে আংশিক রক্ত চাপ এবং আংশিক ব্যাপন চাপের প্রভাবে রক্তরসের কিছু অংশ জালকের বাইরে বের হয়ে এসে কোষান্তর স্থানে জমা হয় এবং এক ধরনের **টিস্যুরস** (tissue fluid)-এ পরিণত হয়। পরিবর্তিত এই টিস্যুরসই হলো **লসিকা**। লসিকা ও কোষের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লসিকা থেকে অক্সিজেন, খাদ্যবস্তুর সারাংশ কোষের ভিতর প্রবেশ করে এবং কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ লসিকায় মুক্ত হয়। লসিকার কিছু অংশ জালকের শিরাপ্রান্তে রক্তপ্রবাহে প্রত্যাবর্তন করে। লসিকা বহনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে **লসিকাজালক** গঠন করে। এসব লসিকা জালকগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে **লসিকানালি** (lymph vessels)তে পরিণত হয়। অন্তর্মুখী লসিকানালি লসিকাগ্রন্থিতে যুক্ত হয় এবং বারবার শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বহির্মুখী লসিকানালিতে পরিণত হয়। সবশেষে লসিকানালি শিরার সাথে যুক্ত হয়। লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন সংবহনকে **লসিকাসংবহন** বলে। লসিকা প্রবাহ ধীর। লসিকানালিতে অবস্থানকারী অসংখ্য কপাটিকা লসিকা প্রবাহকে **একমুখী** (unidirectional) করে রাখে, ফলে লসিকা টিস্যুর দিক থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয়। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে ব্যক্তিকে সক্রিয় থাকতে হয়, না হলে টিস্যুতরল বাহিকায় চলাচল করবেনা, বরং বাহিকার ভিতরে জমতে শুরু করে, ফলে টিস্যু ফুলে যায়। এ অবস্থাকে **শোথ** (edema) বলে।

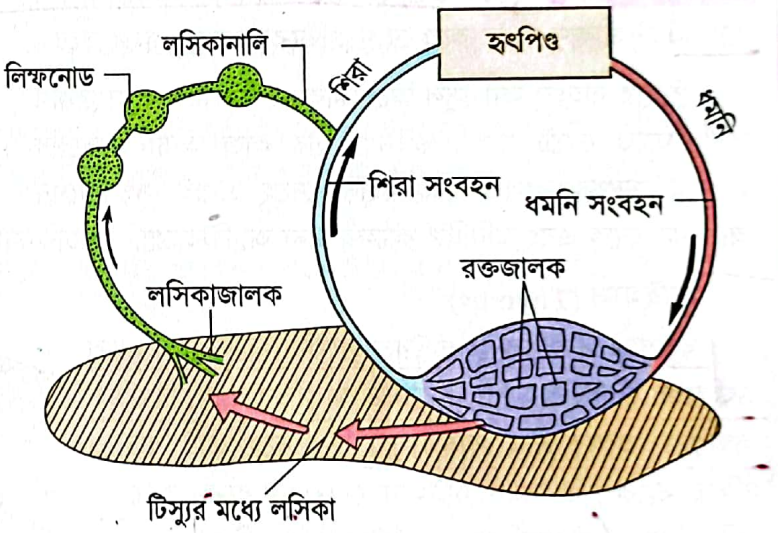

চিত্র ৪.১৪ : লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র

শোথের আরেকটি কারণ হচ্ছে ক্ষতের কারণে রক্ত জালকের ভেদ্যতা বেড়ে যাওয়া। ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যুতে রক্তবাহিকার ভিতর থেকে তরল প্রবাহিত হওয়ায় ক্ষতস্থান ফুলে উঠতে দেখা যায়। মচকানো ফোলা গোড়ালি থেকে শুরু করে ভেঙ্গে যাওয়া বুড়ো আঙ্গুলের ফোলা এ ধরনের উদাহরণ।

CamScanner

রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য		
বৈশিষ্ট্য	রক্ত	লসিকা
১. বর্ণ	লাল বর্ণের পরিবহন টিস্যু।	স্বচ্ছ হলুদ থেকে সাদা বর্ণের পরিবহন টিস্যু।
২. প্রবাহ	রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়।	লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়।
৩. গঠন উপাদান	প্লাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা নিয়ে গঠিত।	প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত।
৪. হিমোগ্লোবিন	হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান।	হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত।
৫. প্রোটিন ইত্যাদি	অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।	অল্প পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।
৬. পরিবহন	রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যসার (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়।	লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়।

ব্যবহারিক (Practical)

কাজ : রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : জীবাণুমুক্ত সুচ, পরিষ্কার স্লাইড, লিশম্যান রঞ্জক, রক্ত, ড্রপার, তুলা, স্পিরিট, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি।

রক্ত সংগ্রহ ও স্লাইড প্রস্তুতি

i. একটি জীবাণুমুক্ত নিডলের (সুচ) সাহায্যে নিজের বাম হাতের মধ্যমার অগ্রভাগ ফুটো করে একবিন্দু রক্ত স্লাইডের একপ্রান্তে সংগ্রহ করতে হবে।

ii. অপর একটি পরিষ্কার স্লাইডের প্রান্ত দিয়ে ৪৫° কোণে রক্তের ফোঁটাটি সামনের দিকে এমনভাবে ঠেলে দিতে হবে যাতে প্রথম স্লাইডের উপর চাপ না পড়ে। ফলে প্রথম স্লাইডের উপর রক্তের একটি পাতলা প্রলেপ (blood flim) তৈরি হবে।

iii. প্রলেপটি বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।

iv. বাতাসে শুকানোর পর প্রলেপটির উপর **লিশম্যান রঞ্জক** দিয়ে প্লাবিত করতে হবে এবং একটি পেট্রিডিস দিয়ে স্লাইডটি ঢেকে রাখতে হবে।

v. এক মিনিট পর (বেশি সময় রাখা যায়) লিশম্যান দ্রবণের সমপরিমাণ পাতিত পানি স্লাইডের উপর অল্প অল্প করে ঢালতে হবে।

vi. এভাবে ১০ মিনিট রাখার পর স্লাইডটি পাতিত পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।

vii. অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

চিত্র ৪.১৫ : (ক) স্লাইড প্রস্তুতকরণ ও (খ) মানুষের রক্ত

CamScanner

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত অথবা বিজ্ঞানাগারে সংরক্ষিত রক্তকণিকার স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রয়োজনে শ্রেণিশিক্ষকের সাহায্য নিতে হবে।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে রক্ত গঠিত।
২. রক্তরসে অসংখ্য লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা বর্তমান।
৩. লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন।
৪. শ্বেত রক্তকণিকা বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং অনিয়তাকার ও অপেক্ষাকৃত বড়।
৫. অণুচক্রিকা ক্ষুদ্র ও নিউক্লিয়াসবিহীন।

সতর্কতা : রক্ত সংগ্রহের আগে অ্যালকোহল দিয়ে নিডল্ ও আঙুলের অগ্রভাগ জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে।

রক্তবাহিকা (Blood Vessels)

যে সব নালিকার মাধ্যমে রক্ত সংবহিত হয়, অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, সেগুলোকে রক্তবাহিকা বলে।

আকার–আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা তিন রকম, যথা–**ধমনি, শিরা ও কৈশিকজালিকা**।

১. ধমনি (Arteries) : যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয়, তাদের **ধমনি** বলে। এক্ষেত্রে **পালমোনারি ধমনি** ব্যতিক্রম; এটি CO_2–সমৃদ্ধ রক্তকে হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে পৌঁছে দেয়। ধমনিপ্রাচীর তিনস্তরবিশিষ্ট, যথা– (ক) যোজক টিস্যুতে গঠিত বাইরের স্তর **টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়া** বা **টিউনিকা এক্সটার্না** (tunica adventitia or tunica externa); (খ) পেশিতন্তু নির্মিত মাঝের স্তর **টিউনিকা মিডিয়া** (tunica media); এবং (গ) এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত অন্তঃস্তর **টিউনিকা ইন্টিমা** (tunica intima)। ধমনিপ্রাচীর বেশ পুরু, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক।

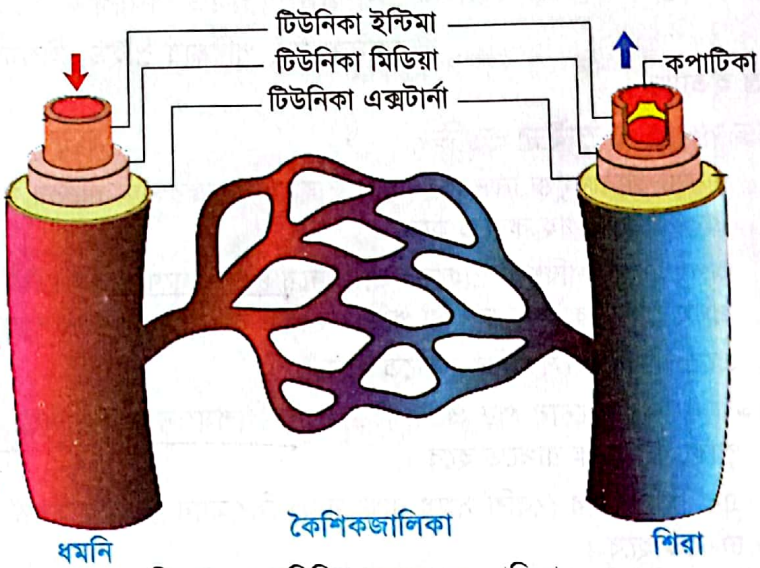

চিত্র ৪.১৬ : বিভিন্ন ধরনের রক্তবাহিকা

ধমনি ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে **সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তজালক** বা **কৈশিকজালিকা**–য় সমাপ্ত হয়। এভাবে, **ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে শুরু হয় এবং কৈশিকজালিকায় শেষ হয়**।

২. শিরা (Veins): যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত **কার্বন ডাইঅক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত** দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে, তাদের **শিরা** বলে। এক্ষেত্রে **পালমোনারি শিরা ব্যতিক্রম**। এটি ফুসফুস থেকে O_2–সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। শিরাপ্রাচীর ধমনির অনুরূপ ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা ও নরম কিন্তু স্থিতিস্থাপক নয়। এদের **লুমেন** (lumen) বড়। ধমনি প্রান্তের কৈশিকজালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা ও পরে বড় শিরা গঠন করে। এভাবে, **শিরা কৈশিকজালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়**।

৩. রক্তজালক বা কৈশিকজালিকা (Capillaries) : শুধুমাত্র একস্তরবিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তবাহিকা যা প্রশাখা-ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে জালিকাকারে বিন্যস্ত, সেগুলোকে **রক্তজালক** বা **কৈশিকজালিকা** বলে। কৈশিকজালিকার রক্ত ও টিস্যুরসের মধ্যে ব্যপন ক্রিয়ায় খাদ্যসার, শ্বসনবায়ু, রেচনদ্রব্য ইত্যাদির আদান–প্রদান ঘটে।

CamScanner

ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য		
বিষয়	ধমনি	শিরা
১. উৎপত্তি ও সমাপ্তি	হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন হয়ে দেহের কৈশিকজালিকায় সমাপ্ত হয়।	কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে সমাপ্ত হয়।
২. রক্ত প্রবাহের দিক	হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে পরিবহন করে।	দেহে থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে।
৩. রক্তের প্রকৃতি	পালমোনারি ধমনি ছাড়া অন্য ধমনিগুলো O_2-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণের।	পালমোনারি শিরা ছাড়া অন্য শিরাগুলো CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত কালচে বর্ণের।
৪. প্রাচীর	বেশ পুরু ও স্থিতিস্থাপক।	কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক।
৫. লুমেন (গহ্বর)	লুমেন ছোট।	লুমেন বেশ বড়।
৬. কপাটিকা	কপাটিকা থাকে না।	সেমিলুনার কপাটিকার মতো কপাটিকা থাকে।

মানব হৃৎপিণ্ড (Human Heart)

দেহের যে প্রকোষ্ঠময় পেশল অঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন ছন্দোময় সঙ্কোচন প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে হৃৎপিণ্ড বলে। রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড **মানবদেহের পাম্পযন্ত্র** (pumping machine) রূপে কাজ করে। জীবন্ত এ পাম্পযন্ত্রটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনীত রক্ত ধমনির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিন্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়) থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লক্ষ টন) রক্ত বের করে দেয়। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে হৃৎপিণ্ডের ওজন ২৫০-৩৯০ গ্রাম ও স্ত্রীতে ২০০-২৭৫ গ্রাম। ভ্রূণ অবস্থায় মাতৃগর্ভে চার সপ্তাহ (Ref: **Langman**-Human Embryology) থেকে হৃদস্পন্দন শুরু হয় এবং আমৃত্যু এ স্পন্দন চলতে থাকে।

অবস্থান (Position)

মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপরে ও দুই ফুসফুসের মাঝ-বরাবর বাম দিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থিত। এটি দেখতে ত্রিকোণাকার; গোড়াটি চওড়া ও ঊর্ধ্বমুখী থাকে, কিন্তু সুচালো শীর্ষদেশ (apex) নিচের দিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্শুকার ফাঁকে অবস্থান করে।

আকার ও আকৃতি (Shape and Size)

লালচে-খয়েরী রংয়ের হৃৎপিণ্ডটি ত্রিকোণা মোচার মতো। এর চওড়া ঊর্ধ্বমুখী অংশটি **বেস** (base), ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটি **এপেক্স** (apex)। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ প্রায় ৮ সেন্টিমিটার।

আবরণ (Covering)

হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। এর নাম **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium)। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের দিক **তন্তুময় পেরিকার্ডিয়াম** (fibrous pericardium) এবং এর ভিতরের দিক **সেরাস পেরিকার্ডিয়াম** (serous pericardium) নামে পরিচিত। সেরাস পেরিকার্ডিয়াম আবার দুটি স্তরে বিভক্ত, বাইরের দিকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) এবং ভিতরের দিকে **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer)। প্যারাইটাল ও ভিসেরাল স্তরদুটির মাঝে **পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড** (pericardial fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে। এ তরল হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

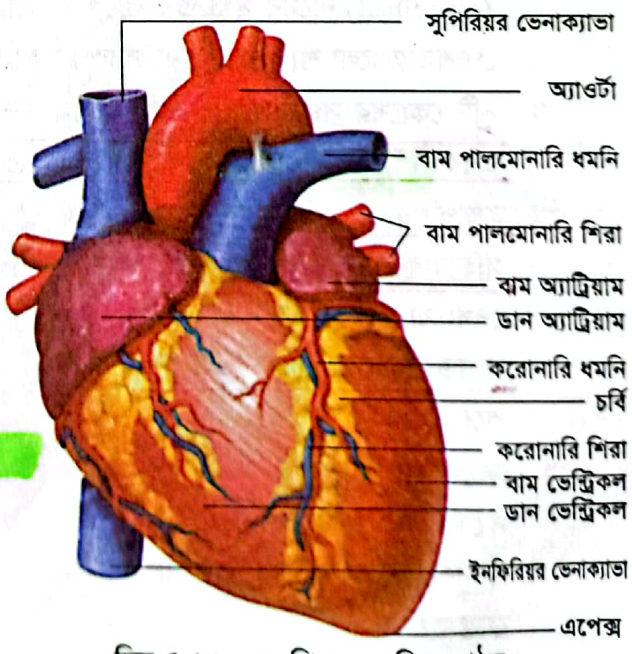

চিত্র ৪.১৭ : হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

CamScanner

প্রাচীর (Wall)

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত। এর প্রাচীর গঠনকারী পেশিকে কার্ডিয়াক পেশি (cardiac muscles) বলে। পেশি ও যোজক টিস্যু তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থেকে হৃৎপিন্ডের প্রাচীর গঠন করে। স্তরতিনটি হলো–

১. এপিকার্ডিয়াম (Epicardium) : এটি পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সর্ববহিঃস্থ স্তর। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

২. মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium) : এটি কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। এ স্তরটি সর্বাপেক্ষা পুরু। এ স্তরের পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হৃৎপিন্ড সঙ্কোচন–প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

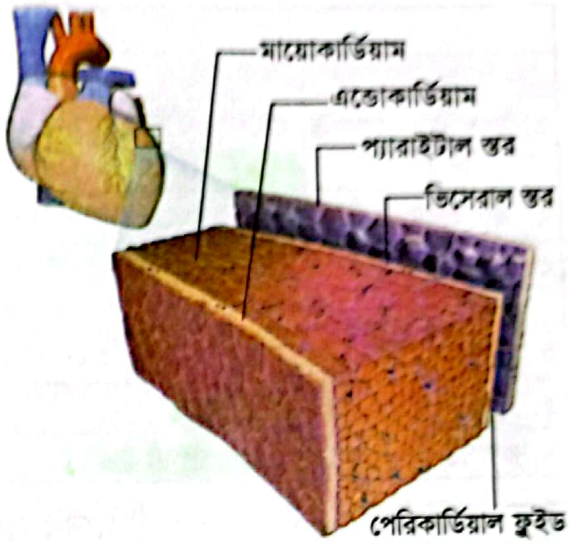

চিত্র ৪.১৮ : হৃৎপিণ্ডের আবরণ ও প্রাচীর

৩. এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium) : এটি যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর। এটি হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎকপাটিকাসমূহ ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিন্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

কার্ডিয়াক পেশির বৈশিষ্ট্য : হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মায়োকার্ডিয়াল স্তর বিশেষ ধরনের পেশি দিয়ে গঠিত যাকে কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি বলে। এ পেশির কিছু বৈশিষ্ট্য রৈখিক বা কঙ্কাল পেশির মতো হলেও প্রকৃত পক্ষে এরা বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রতিরক্ষাকারী স্তর গঠন করে এবং নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য বহন করে :

- অসংখ্য নলাকার পেশিতন্তু নিয়ে এ পেশি গঠিত। কোষগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ০.৮ mm ও ব্যাস ১২–১৫ μm.
- প্রতিটি কোষ সারকোলেমা (sarcolemma) নামক সূক্ষ্ম ঝিল্লিতে আবৃত এবং কোষের মাঝখানে একটি ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে।
- কোষের সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ **সারকোপ্লাজম** (sarcoplasm)-এ সমান্তরালে সজ্জিত **মায়োফাইব্রিল** (myofibril) নামের সূক্ষ্ম তন্তু থাকে। মায়োফাইব্রিলের গায়ে অনুপ্রস্থ রেখা দেখা যায়।
- পেশিতন্তুগুলো **শাখাতন্তু** দ্বারা পরস্পর অনিয়মিতভাবে যুক্ত হয়ে জালিকাকার গঠন তৈরি করে।
- দুটি কোষের সংযোগস্থলে সারকোলেমা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে অনুপ্রস্থভাবে পুরু চাকতির মতো গঠন তৈরি করে। একে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক (intercalated disc) বলে।
- হৃৎপেশির কোষগুলোতে মাইটোকন্ড্রিয়ার আধিক্যতা দেখা যায় যা কোষের অবিরাম অবাত শ্বসনের সুযোগ প্রদান করে।
- হৃৎপেশির স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোময় সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা সম্পূর্ণরূপে অনৈচ্ছিক, কখনো ক্লান্ত হয় না।

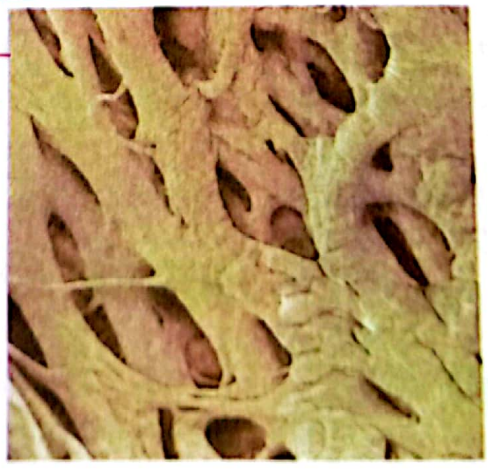

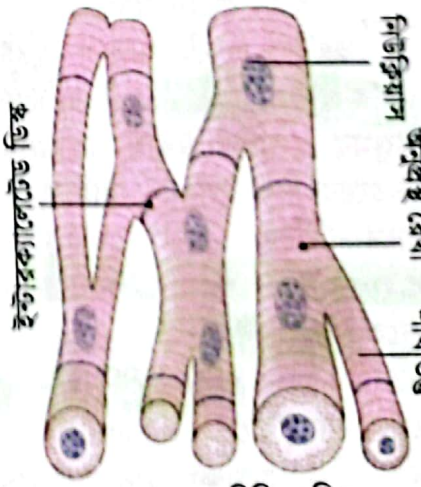

চিত্র ৪.১৯ : কার্ডিয়াক পেশি; বায়ে-ফটোমাইক্রোগ্রাফ ও ডানে-চিহ্নিত চিত্র

CamScanner

হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠসমূহ (Chambers of Heart)

মানব হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (completely four chambered) একটি ফাঁপা অঙ্গ। এর মধ্যে উপরের দুটি **অ্যাট্রিয়া** (atria: একবচনে atrium) বা **অলিন্দ** ও নিচের দুটি **ভেন্ট্রিকল** (ventricle) বা **নিলয়**। দুটি অ্যাট্রিয়াকে দেহের অবস্থান অনুসারে **ডান অ্যাট্রিয়াম** ও **বাম অ্যাট্রিয়াম** বলে এবং ভেন্ট্রিকল দুটিকে **ডান ভেন্ট্রিকল** ও **বাম ভেন্ট্রিকল** বলা হয়। অ্যাট্রিয়ামের তুলনায় ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। ডান ও বাম অ্যাট্রিয়াম **আন্তঃঅ্যাট্রিয়াল** (আন্তঃঅলিন্দ) **পর্দা** (inter-atrial septum) এবং ডান ও বাম ভেন্ট্রিকল **আন্তঃভেন্ট্রিকুলার** (আন্তঃনিলয়) **পর্দা** (inter-ventricular septum) দিয়ে পৃথক থাকে। নিচে প্রকোষ্ঠগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

❐ **ডান অ্যাট্রিয়াম :** এ প্রকোষ্ঠ ডান পাশে অবস্থিত, অপেক্ষাকৃত বড় ও পাতলা প্রাচীরে গঠিত। এর ভিতরের গায়ে **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) বা **পেস মেকার** (pace maker) নামে একটি কোষগুচ্ছ থাকে। এখান থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। ডান অ্যাট্রিয়াম **সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা** (অগ্র বা উর্ধ্ব মহাশিরা) ও **ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (পশ্চাৎ বা নিম্ন মহাশিরা)-র মাধ্যমে যথাক্রমে দেহের উর্ধ্ব ও নিম্ন অঞ্চল থেকে এবং করোনারি শিরা ও করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের প্রাচীর থেকে ফিরে আসা CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। **ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র** (right atrio- ventricular aperture)-এর মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম ডান ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত হয়। এ ছিদ্রপথে **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (tricupid valves) নামে তিনটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এ কপাটিকা ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে আসতে দেয়, কিন্তু ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না অর্থাৎ কপাটিকাটি একমুখী।

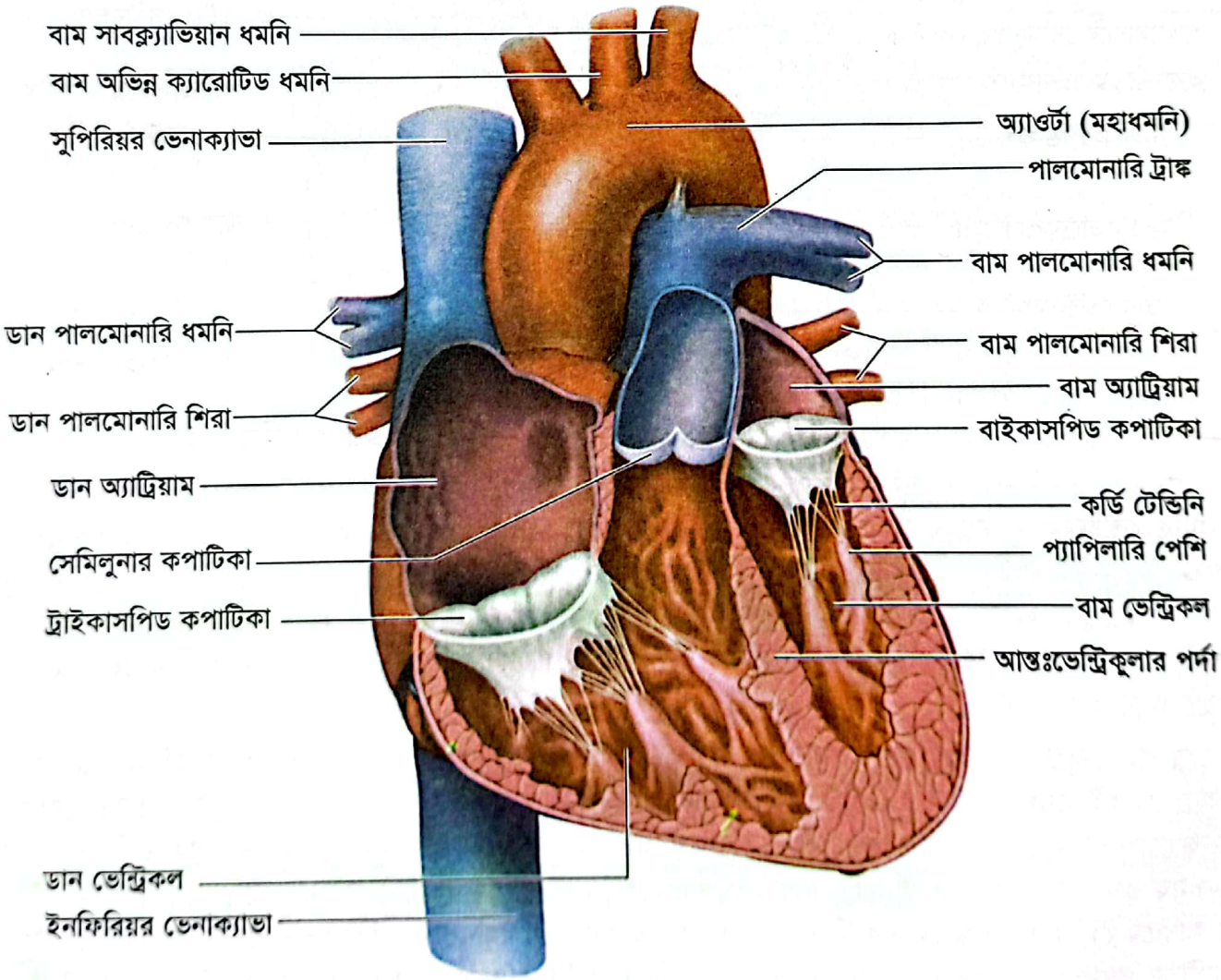

চিত্র ৪.২০ : মানব হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন

CamScanner

❐ **বাম অ্যাট্রিয়াম :** এ প্রকোষ্ঠ বাম পাশে অবস্থিত ও অপেক্ষাকৃত ছোট ও পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট। প্রকোষ্ঠটি পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে ফিরে আসা O_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম অ্যাট্রিয়াম বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত প্রেরণ করে। এ ছিদ্রমুখে বাইকাসপিড কপাটিকা (bicuspid valves) বা মাইট্রাল কপাটিকা (mitral valves) নামক দুটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এটি একমুখী কপাটিকা। এ কপাটিকা বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত যেতে দেয়, কিন্তু বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলোর এক প্রান্ত অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকল ছিদ্রের মুখে এবং অপর প্রান্ত ভেন্ট্রিকলের অন্তঃপ্রাচীরের গাত্রে কর্ডি টেন্ডিনি (chordae tendinae) নামক তন্তুর সাহায্যে যুক্ত থাকে।

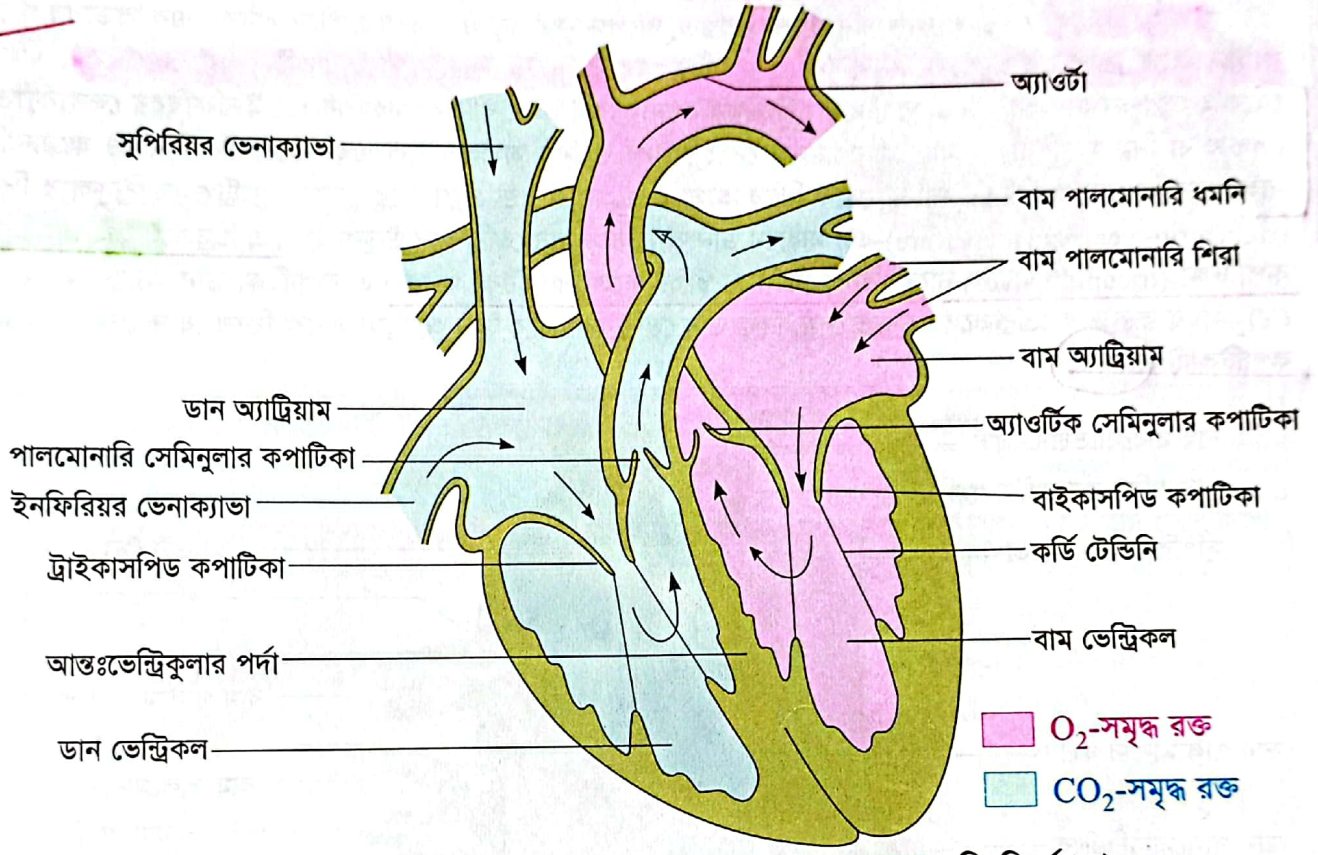

চিত্র ৪.২১ : হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ (⟶ = রক্তের গতি নির্দেশক)

❐ **ডান ভেন্ট্রিকল :** ডান ভেন্ট্রিকল বাম ভেন্ট্রিকল অপেক্ষা কিছুটা বড় এবং ডানে অবস্থিত। এটি ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে। ডান ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ ভাগ থেকে ফুসফুসীয় ধমনি (pulmonary artery) সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে সঞ্চালিত হয়। এ ধমনির মুখে একটি একমুখী অর্ধচন্দ্রাকার বা সেমিলুনার কপাটিকা (semilunar valve) থাকে। এ কপাটিকাকে পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা বলে। এ কপাটিকা পালমোনারি ধমনি থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্ত ফেরত আসতে দেয় না।

❐ **বাম ভেন্ট্রিকল :** হৃৎপিন্ডের বাম দিকে অবস্থিত বাম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর তুলনামূলকভাবে অধিক পুরু কারণ এ প্রকোষ্ঠ থেকেই সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরিত হয় (অন্যদিকে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত কেবল ফুসফুসে প্রেরিত হয়) যাতে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। বাম ভেন্ট্রিকল বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ থেকে সিস্টেমিক মহাধমনি বা অ্যাওর্টা (aorta) উৎপন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরিত হয়। এ ধমনির উৎপত্তিস্থলেও একটি একমুখী সেমিলুনার কপাটিকা থাকে যা রক্তকে মহাধমনি থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে দেয় না। এ কপাটিকার নাম অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা (aortic semilunar valve)।

CamScanner

[শারীরবিজ্ঞানের আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী হৃৎপিন্ডের উর্ধ্ব প্রকোষ্ঠদুটিকে auricle (অলিন্দ) নামের পরিবর্তে **atrium** বলে, যথা– right atrium ও left atrium। এ বইয়েও তাই auricle বা অলিন্দের পরিবর্তে ডান অ্যাট্রিয়াম ও বাম অ্যাট্রিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, auricle বলতে মেরুদন্ডী প্রাণীর বহিঃকর্ণ (external ear) কে বোঝায়।]

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ (Valves of Heart)

হৃৎপিণ্ডের মধ্যদিয়ে রক্ত প্রবাহ একমুখী করার জন্য এবং O_2-সমৃদ্ধ ও CO_2-সমৃদ্ধ রক্তের মিশ্রণ প্রতিহত করার জন্য হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে **কপাটিকা** থাকে। হৃৎপিণ্ডের অন্তঃপ্রাচীর বা এন্ডোকার্ডিয়াম ভাঁজ হয়ে কপাটিকা গঠিত হয়। নিচে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলো ছক আকারে দেখানো হলো।

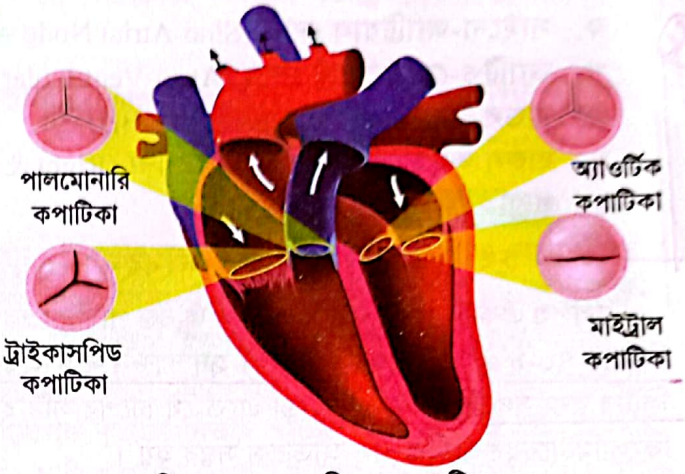

চিত্র ৪.২২ : হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ

মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকার নাম, অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও কাজ

নাম	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য	কাজ
১. বাইকাসপিড কপাটিকা বা মাইট্রাল কপাটিকা বা দ্বিপত্রী কপাটিকা	বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগ-স্থলে।	দুটি ঝিল্লিময় কপাটিকা।	বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
২. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বা ত্রিপত্রী কপাটিকা	ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগ-স্থলে।	তিন ঝিল্লিময় কপাটিকা।	ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৩. অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকল ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার বা অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা।	বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৪. পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা।	ডান ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ধমনিতে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৫. থিবেসিয়ান বা করোনারি কপাটিকা	করোনারি সাইনাস ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা।	করোনারি সাইনাস থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৬. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা	ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থল।	সেমিলুনার কপাটিকা।	ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

CamScanner

হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যু (Junctional Tissues of Heart)

হৃৎপেশিতে কতগুলো প্রয়োজনীয় ও বিশেষ ধরনের গঠন থাকে যারা হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও পরিবহন করে। এদেরকে হৃৎপিণ্ডের সংযোগী বা জাংশনাল টিস্যু বলে। এগুলো হলো :

ক. **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (Sino-Atrial Node = SAN)
খ. **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড** (Atrio-Ventricular Node = AVN)
গ. **বান্ডল অব হিজ** (Bandle of His = BH)
ঘ. **বান্ডল অব হিজের ডান ও বাম শাখা** (Right & Left branches of BH)
ঙ. **পারকিঞ্জি তন্তু** (Purkinje fibres)

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন – Circulation of Blood through the Heart

হৃৎপিণ্ড একটি সঙ্কোচন-প্রসারণশীল জীবন্ত পাম্পযন্ত্রের মতো কাজ করে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার (গড়ে ৭৫ বার) হৃদস্পন্দন ঘটে অর্থাৎ দিনে প্রায় একলক্ষ বার স্পন্দন ঘটে। এতে প্রায় ১৪০০ লিটার রক্ত সঞ্চালিত হয়। তাছাড়া এতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে ধমনি, শিরা ও কৈশিকজালকের মাধ্যমে ৮০,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক পথ অতিক্রম সম্ভব হয়।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে **সিস্টোল** (systole) ও **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে। একটি সিস্টোল ও তার পরবর্তী একটি ডায়াস্টোল নিয়ে একটি **হৃদস্পন্দন** (heart beat) সম্পন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টোলের সময় রক্ত হৃৎপিণ্ডের গহ্বরে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী সিস্টোলের সময় রক্ত হৃৎপিণ্ডের গহ্বর থেকে সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। এভাবে একটি ছন্দোময় পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে কোন নিউরন নেই। **সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড** বা **পেসমেকার** (sinoatrial node or pace maker) এবং অন্যান্য নোডাল টিস্যুর মাধ্যমে হৃৎস্পন্দন শুরু ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে নিচে বর্ণিত উপায়ে রক্ত সংবহিত হয়।

- দেহের উর্ধ্বভাগ থেকে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার (উর্ধ্ব মহাশিরা) মাধ্যমে এবং নিম্নভাগ থেকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার (নিম্ন মহাশিরা) মাধ্যমে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। একই সময়ে পালমোনারি শিরার মাধ্যমে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসদ্বয় থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে আসে।
- অ্যাট্রিয়ামদুটি সঙ্কুচিত হলে অ্যাট্রিয়ামের ভিতরে চাপ বৃদ্ধির কারণে বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকলের ছিদ্রপথের বাইকাসপিড কপাটিকা ও ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকলের ছিদ্রের ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ফলে বাম অ্যাট্রিয়ামের রক্ত বাম ভেন্ট্রিকলে এবং ডান অ্যাট্রিয়ামের রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে প্রবেশ করে।
- অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে রক্ত আসার পর পরই **অ্যাট্রিয়ামের শ্লথন** (relaxation) ঘটতে শুরু করে এবং একই সময়ে ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচন ঘটে।

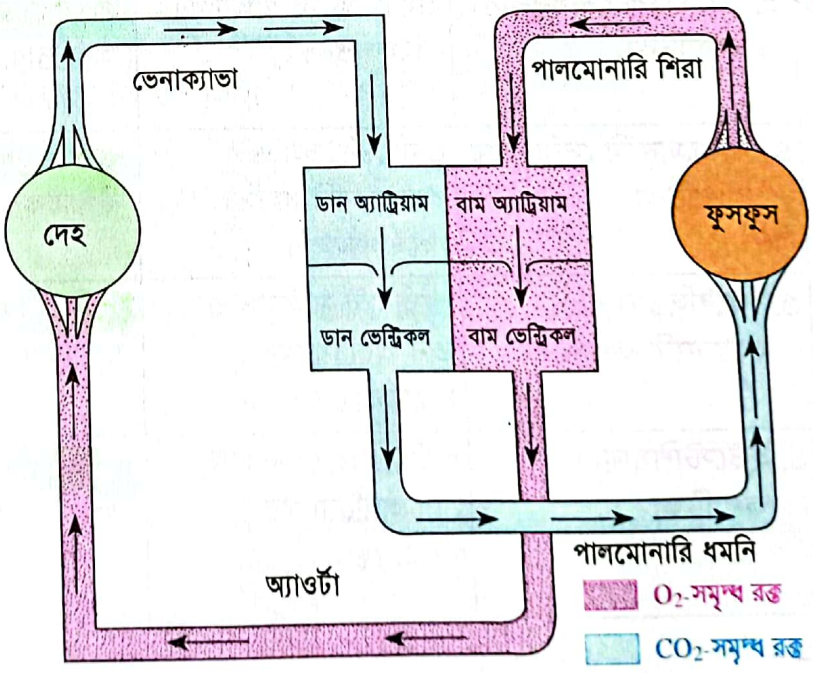

চিত্র ৪.২৩ : হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন (চিত্রানুগ)

CamScanner

- ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনে ভেন্ট্রিকলে চাপ বৃদ্ধির কারণে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয় এবং অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির মুখের সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়।
- ফলে বাম ভেন্ট্রিকলের O_2-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টা দিয়ে সমগ্রদেহে ও ডান ভেন্ট্রিকলের CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনি পথে ফুসফুসের দিকে ধাবিত হয়।

এভাবেই হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচন-শ্লথন (contraction-relaxation) অর্থাৎ স্পন্দনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন সংঘটিত হয়।

দ্বিবর্তনী সংবহন (Double Circulation)

মানুষের হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে **দ্বিবর্তনী সংবহন** সংঘটিত হয়। দ্বিবর্তনী সংবহনের অর্থ হলো রক্ত সমগ্র দেহে প্রতিবার সংবহনের জন্য দুবার হৃৎপিণ্ড অতিক্রম করে। দ্বিবর্তনী সংবহনের মধ্যে **একটি হচ্ছে পালমোনারি (pulmonary) সংবহন**–হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুস এবং **অন্যটি সিস্টেমিক (systemic) সংবহন**–হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের অবশিষ্ট অংশে। দ্বিবর্তনী সংবহনের সুবিধা হলো অক্সিজেন গ্রহণের জন্য রক্তকে ফুসফুসে প্রেরণ করা যায় এবং সমগ্র দেহে সংবহনের জন্য পুনরায় পাম্প করার আগে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে। হৃৎপিণ্ড দুভাগে বিভক্ত থাকার জন্য দ্বিবর্তনী সংবহন সম্ভব হয়েছে। একটি অ্যাট্রিয়াম এবং একটি ভেন্ট্রিকল সমন্বয়ে প্রতি অর্ধাংশ গঠিত। একটি অর্ধাংশ (ডান অর্ধাংশ) CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রেরণ করে, এবং অন্য অর্ধাংশ (বাম অর্ধাংশ) O_2-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের অবশিষ্ট অংশে প্রেরণ করে।

হৃৎপিণ্ড কখনও অবসন্ন হয় না কেন ? (Why is heart never fatigued?) : একটি উদ্দীপনা প্রয়োগের পরবর্তী যে সময়কালের মধ্যে কোনো উদ্দীপনশীল কোষ বা টিস্যু দ্বিতীয় উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না, তাকে **নিঃসাড়কাল** (refractory period) বলে। হৃৎপিণ্ড গঠনকারী হৃৎপেশি দীর্ঘতম নিঃসাড়কালের অধিকারী হওয়ায় তা কখনও অবসন্ন হয় না। সাধারণত পরপর সঙ্কোচনের ফলে বিপাকীয় বর্জ্য (বিশেষ করে ল্যাকটিক এসিড) জমা হওয়ার কারণে কোষ বা টিস্যু অবসন্ন হয়। হৃৎপেশির নিঃসাড়কাল দীর্ঘ হওয়ায় তা ঐ সময়ের মধ্যে বর্জ্য পদার্থ থেকে মুক্ত হয়। এছাড়া হৃৎপেশি সরাসরি ল্যাকটিক এসিডকে পুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারে। এসব কারণে হৃৎপিণ্ড কখনও অবসন্ন হয় না।

হৃৎপিন্ডের প্রধান গাঠনিক উপাদানসমূহ এবং এদের কাজ

হৃৎপিন্ডের গাঠনিক উপাদান	প্রধান কাজ
অ্যাওর্টা	অ্যাওর্টা দেহের বৃহত্তম ধমনি। সকল অঙ্গে O_2-সমৃদ্ধ (oxygenated) রক্ত পরিবহন করে।
পালমোনারি শিরা	ফুসফুস থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিন্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে পরিবহন করে।
বাম অ্যাট্রিয়াম	পালমোনারি শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে।
বাম ভেন্ট্রিকল	হৃৎপিন্ডের সর্বাধিক পেশিবহুল অংশ। অ্যাওর্টার মাধ্যমে সারাদেহে রক্ত পাম্প করে।
বাইকাসপিড কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনকালে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
কর্ডি টেন্ডিনি	ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনকালে কপাটিকার অভ্যন্তরভাগ বাইরের দিকে ঘুরে যাওয়া প্রতিরোধ করে এবং কপাটিকাকে প্যাপিলারি পেশির সাথে সংযুক্ত করে রাখে।
ডান ভেন্ট্রিকল	পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে CO_2-সমৃদ্ধ রক্তকে ফুসফুসে পাম্প করে।
ট্রাইকাসপিড কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনকালে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
সেমিলুনার কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকলের শিথিল অবস্থায় পালমোনারি ধমনি থেকে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে এবং মহাধমনি থেকে রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে পশ্চাৎ প্রবাহে বাধা দেয়।
ডান অ্যাট্রিয়াম	দেহের সকল অঙ্গ থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে।
ভেনা ক্যাভা	দেহের এই প্রধান শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে।

CamScanner

মাছ এবং মানুষের হৃৎপিন্ডের মধ্যে পার্থক্য	
মাছের হৃৎপিন্ড	**মানুষের হৃৎপিন্ড**
১. দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।	১. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
২. ১টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল।	২. দুটি অ্যাট্রিয়া ও দুটি ভেন্ট্রিকল।
৩. সাইনাস ভেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ আছে।	৩. সাইনাস ভেনোসাস নেই।
৪. কেবল CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	৪. O_2- সমৃদ্ধ ও CO_2-সমৃদ্ধ উভয় ধরনের রক্ত পরিবহন করে।
৫. একচক্রী রক্ত সংবহন ঘটে।	৫. দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে।

হার্টবিট-কার্ডিয়াক চক্র (Cardiac Cycle)

হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়া ও ভেন্ট্রিকলদুটির পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভিতরে গতিশীল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** (systole) ও প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে। হৃৎপিণ্ডের একবার সঙ্কোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে **হার্টবিট বা হৃদস্পন্দন** (heart beat) বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির হৃদস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। প্রতি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের যে চক্রাকার ঘটনাবলি অনুসৃত হয় তাকে **কার্ডিয়াক চক্র** বা হৃদচক্র বলে। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হার্টবিট হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল $\frac{৬০}{৭৫}$ = ০.৮ সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাট্রিয়াল চক্র এবং ভেন্ট্রিকুলার চক্র উভয়েরই স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড।

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন হৃৎপিন্ডের মধ্যে রক্ত সংবহন

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন কীভাবে হৃৎপিন্ডে রক্ত সংবহন হয় তা নিচের চারটি ঘটনাবলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল (Atrial diastole) : এ সময় অ্যাট্রিয়ামদুটি প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। অ্যাট্রিয়াম-মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে ও পালমোনারি শিরা দিয়ে

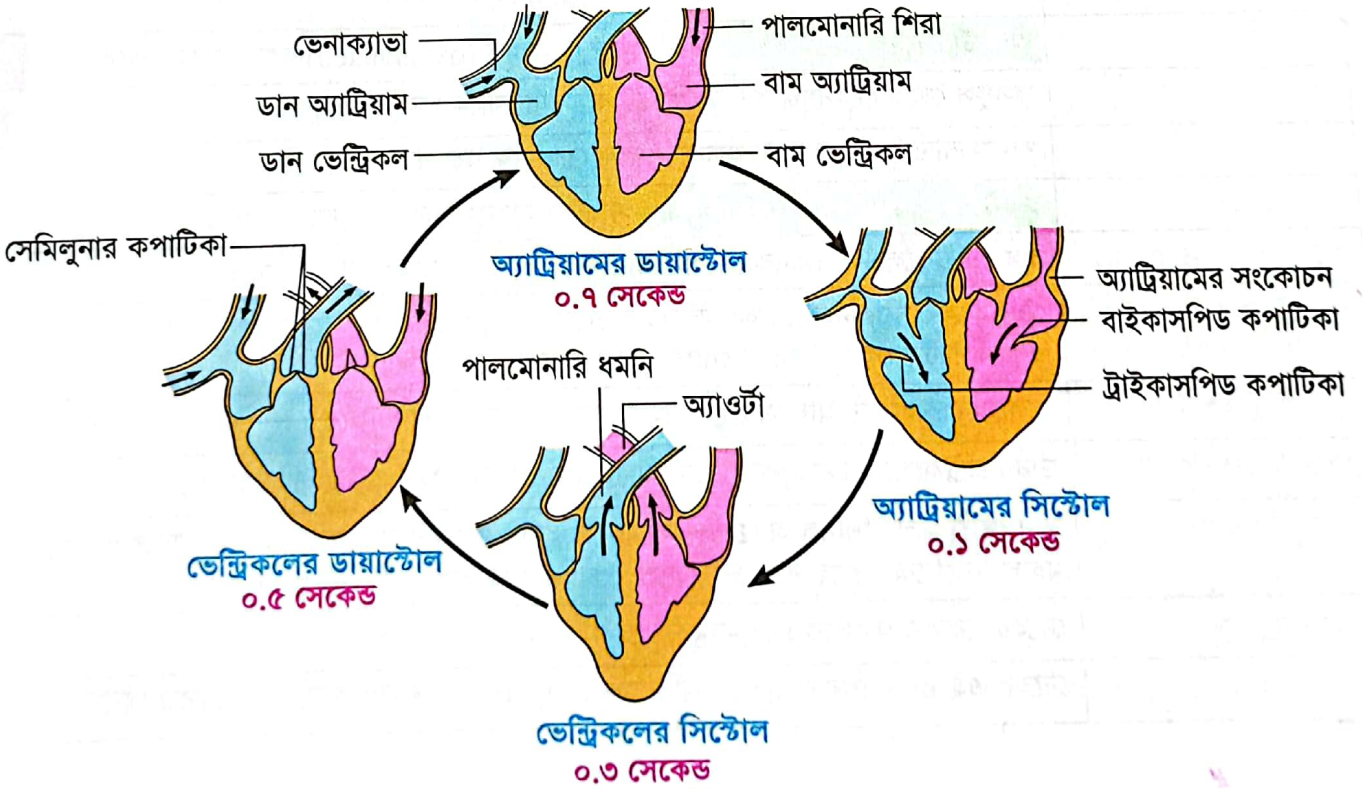

চিত্র ৪.২৪ : কার্ডিয়াক চক্র

CamScanner

ফুসফুস থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। এ সময় হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকেও CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। অ্যাট্রিয়ামদুটি রক্তপূর্ণ হলে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ঘটে। এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড।

২. অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল (Atrial systole) : অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অ্যাট্রিয়াম সঙ্কুচিত হয়। যদিও সঙ্কোচনের ঢেউ প্রথমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে শুরু হয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। ডান অ্যাট্রিয়ামের **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) থেকে সঙ্কোচনের সূত্রপাত ঘটে। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ০.১ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রথম ০.০৫ সেকেন্ড সঙ্কোচন সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে, একে ডায়নামিক (dynamic) পর্যায় বলে। আর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ পরবর্তী ০.০৫ সেকেন্ড ক্ষীণতর হতে হতে প্রশমিত হয়। একে বলে অ্যাডায়নামিক (adynamic) পর্যায়। এ পর্যায়ে অল্প পরিমাণ রক্ত (১০%) অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে যায়।

৩. ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল (Ventricular systole) : অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরপরই (প্রায় ০.১–০.২ সেকেন্ড পর) ভেন্ট্রিকলদুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সঙ্কুচিত হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। এতে লাব (lub) সদৃশ প্রথম শব্দের সৃষ্টি হয়। ভেন্ট্রিকল-মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত ভেন্ট্রিকলের বাইরে নির্গত হয়। ডান ভেন্ট্রিকল থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম ভেন্ট্রিকল থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

৪. ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole) : ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের পরপরই এর ডায়াস্টোল শুরু হয়। এ দশার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড। যখনই ভেন্ট্রিকল প্রসারিত হতে থাকে তখন ভেন্ট্রিকল মধ্যস্থ চাপ কমতে থাকে। ফলে অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির রক্ত ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু অতি দ্রুত সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। ভেন্ট্রিকলে আসা রক্তে ৯০% ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোলের জন্য আসে। বাকি১০% অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের ফলে ভেন্ট্রিকলে আসে। এ সময় ডাব (dub) সদৃশ দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং, হৃৎপিন্ডের শব্দগুলো হচ্ছে–

ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল= লাব (lub); ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব (dub)।

অ্যাট্রিয়াম		ভেন্ট্রিকল	
ডায়াস্টোল	সিস্টোল	ডায়াস্টোল	সিস্টোল
০.৭ সে.	০.১ সে.	০.৫ সে.	০.৩ সে.

ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এর ভিতরকার চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এবং তা যখন অ্যাট্রিয়ামের চাপের নিচে নেমে যায় তখন অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা খুলে যায়। ভেন্ট্রিকল তখন অ্যাট্রিয়াম থেকে আগত রক্তে পূর্ণ হতে থাকে। ভেন্ট্রিকলে আসা রক্তের ৯০% ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোলের কারণে আসে। বাকি ১০% অট্রিয়ামের সিস্টোলের ফলে ভেন্ট্রিকলে আসে। সামান্য বিশ্রামের পর আবার আগের মতো ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরু হয়।

হার্টবিট-এর মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্দীপনা পরিবহন
(Myogenic Regulation of Heart Beat and Transmission of Impulse)

মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কুচিত–প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ (myogenic = muscle origin; myo = muscle + genic = giving rise to) বলে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোন উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে হৃৎস্পন্দন তৈরি হয়। কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে O_2-সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দিলে তাতে বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই বেশ কিছু সময় পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৃৎপেশি কোষগুচ্ছ মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডের এ বিশেষ ধরনের পেশিতন্তুগুলোকে সম্মিলিতভাবে সংযোগী টিস্যু বা জাংশনাল টিস্যু (junctional tissue) বলে। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যুগুলো নিচে বর্ণিত চার ধরনের।

CamScanner

১. সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node, সংক্ষেপে SAN) : এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে, ডান অ্যাট্রিয়াম ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomic nervous system) থেকে কিছু স্নায়ুপ্রান্তসহ অল্প সংখ্যক হৃৎপেশিকোষ নিয়ে গঠিত। এগুলো ১০–১৫ mm লম্বা, ৩ mm চওড়া এবং ১ mm পুরু। SAN থেকে সৃষ্ট একটি অ্যাকশন পটেনশিয়াল (action potential) ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে হার্টবিট শুরু হয়। এ অ্যাকশন পটেনশিয়াল ছড়িয়ে সাথে সাথে স্নায়ু উদ্দীপনার অনুরূপ উত্তেজনার একটি ছোট তরঙ্গ হৃৎপেশির দিকে অতিক্রান্ত হয়। এটি অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে ছড়িয়ে অ্যাট্রিয়ামের সঙ্কোচন ঘটায়। SAN-কে পেসমেকার (pacemaker) বা হৃদস্পন্দক বলে, কারণ প্রতিটি হৃদস্পন্দনের উদ্দীপনা (cardiac impulse) এখানেই সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী হৃদস্পন্দনের উদ্দীপনা সৃষ্টির উদ্দীপক হিসেবেও এটি কাজ করে।

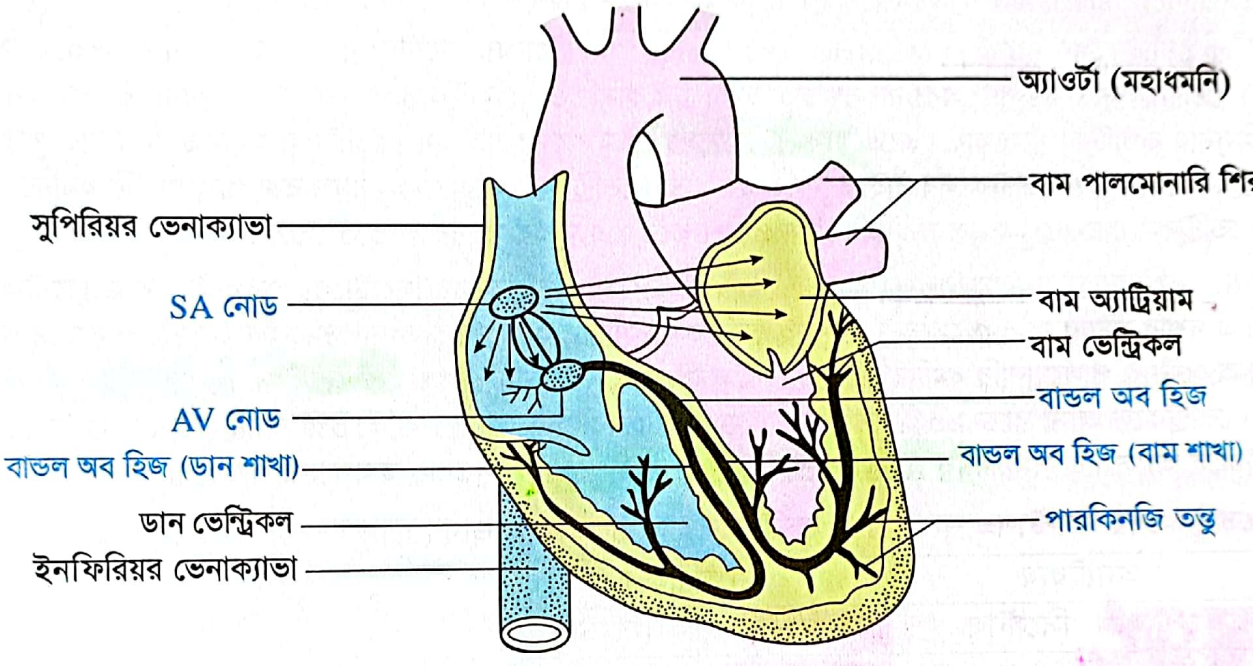

চিত্র ৪.২৫ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যু

২. অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-Ventricular Node, সংক্ষেপে AVN) : AVN ডান অ্যাট্রিয়ামের পশ্চাৎ প্রাচীরে ট্রাইকাসপিড কপাটিকার ঠিক পিছনে অবস্থিত। SAN-এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্ট্যের AVN টিস্যু AV বান্ডেল নামক বিশেষ পেশিতন্তু গুচ্ছের সাথে যুক্ত থাকে। SAN থেকে AVN এ উদ্দীপনা পরিবহনে ০.০৩ সেকেন্ড সময় লাগে। AVN-এ আগত উদ্দীপনা ০.০৯ সেকেন্ড দেরি করে। একে AV Nodal Delay বলে। এরপর AVN থেকে AV bundle এর মাধ্যমে উদ্দীপনা ভেন্ট্রিকলের পেশিতে পৌঁছতে আরও ০.০৪ সেকেন্ড সময় লাগে। অর্থাৎ SAN এ উদ্দীপনা তৈরি হওয়ার পরে উদ্দীপনা ভেন্ট্রিকলে পৌঁছতে মোট ০.১৬ সেকেন্ড সময় লাগে। এর ফলে ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরুর পূর্বে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল সম্পন্ন হয়।

৩. বান্ডল অব হিজ (Bundle of His) : হৃৎপিণ্ডের এ বিশেষ টিস্যুটি AV নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তঃভেন্ট্রিকুলার (আন্তঃনিলয়) প্রাচীরের পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ডান ও বাম শাখায় বিভক্ত হয়ে ভেন্ট্রিকলের পারকিঞ্জি তন্তুতে মিলিত হয়। এটি AV নোড থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে সঞ্চারণ ঘটায়।

৪. পারকিঞ্জি তন্তু (Purkinje fibre) : এ তন্তুগুলো বাণ্ডল অব হিজ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে জালক সৃষ্টি করে। বান্ডল অব হিজ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা পারকিঞ্জি তন্তুর মাধ্যমে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে ছড়িয়ে পড়ে ভেন্ট্রিকল দুটির সঙ্কোচন ঘটায়। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যুগুলোর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের অনুক্রমটি নিম্নরূপ :

SA নোড → AV নোড → বান্ডল অব হিজ → পারকিঞ্জি তন্তু

CamScanner

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা
(Role of Baroreceptor in Controlling Blood Pressure)

রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার (Blood pressure)

রক্তনালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রাচীর গাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে **রক্তচাপ** বলে। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ করে ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এর সঙ্কোচনের ফলেই রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে অব্যাহত বহমান থাকে। **ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচন** (systole) অবস্থায় রক্তচাপ বেশি থাকে এবং এ চাপকে **সিস্টোলিক চাপ** (systolic pressure) বলে। অন্যদিকে **ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ** (diastole) কালে রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। একে বলা হয় **ডায়াস্টোলিক চাপ** (diastolic pressure)। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে ১০০-১৩৯ mmHg (অপটিমাম ১২০ mmHg) এবং স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ ৬০–৮৯ mmHg (অপটিমাম ৮০ mmHg)। রক্ত স্বাভাবিক সীমার উপরে থাকলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** (hypertension) এবং স্বাভাবিক সীমার নিচে থাকলে তাকে **নিম্ন রক্তচাপ** (hypotension) বলে। মানুষের রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম **স্ফিগমোম্যানোমিটার** (sphygmomanometer)। বয়স, লিঙ্গ, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি কারণে মানুষের রক্তচাপের তারতম্য ঘটে।

ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptors)

মানুষের রক্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ সংবেদী স্নায়ু প্রান্ত (sensory nerve ending) থাকে। এগুলো রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং দেহে রক্ত চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। এ সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে **ব্যারোরিসেপ্টর** বলে। এসব স্নায়ু প্রান্ত অস্বাভাবিক রক্তচাপ শনাক্ত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যে বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন মাত্রা ও শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিককরণে ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি **ব্যারোরিফ্লেক্স** (baroreflex) নামে পরিচিত।

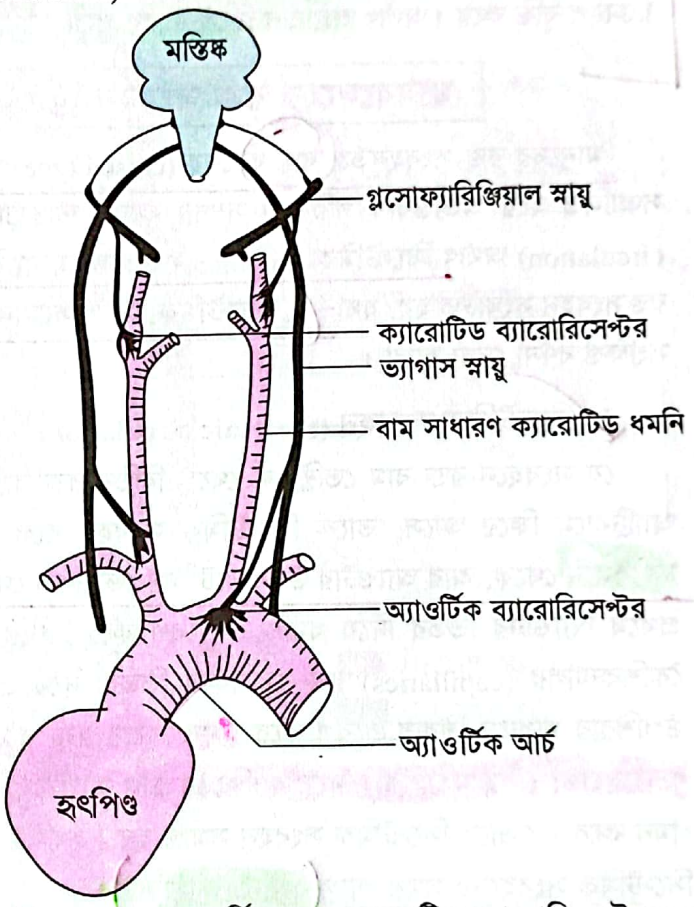

চিত্র ৪:২৬ : অ্যাওর্টিক এবং ক্যারোটিক ব্যারোরিসেপ্টর

ব্যারোরিসেপ্টর দু'রকম–**উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর** এবং **নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর**।

১. উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (High-Pressure Baroreceptors) বা আর্টারিয়াল ব্যারোরিসেপ্টর (Arterial Baroreceptors) : অনুপ্রস্থ অ্যাওর্টিক আর্চ এবং ডান ও বাম অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনির ক্যারোটিড সাইনাস-এ এসব ব্যারোরিসেপ্টর অবস্থান করে। রক্তের চাপ বেড়ে গেলে অর্থাৎ রক্তনালির প্রসারণ ঘটলে সেখানকার ব্যারোরিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত হয় এবং এ উদ্দীপনা মস্তিষ্কের মেডুলায় সঞ্চালিত হয় এবং এখানে ভ্যাসোমোটর (vasomotor) কেন্দ্রটি দমিত হয়। ফলে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু বরাবর হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালিতে চেষ্টীয় (motor) বা আজ্ঞাবহ উদ্দীপনা পরিবহনের হার হ্রাস পায়। আজ্ঞাবহ উদ্দীপনার কমতিতে হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং ক্রিয়া এবং রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহনের মাত্রা কমে যায়। এভাবে রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রক্তচাপ পড়ে গেলে (যেমন–মানসিক আঘাতে) ক্যারোটিড ও অ্যাওর্টিক ব্যারোরিসেপ্টর থেকে সংকেত যথাক্রমে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল ও ভেগাস স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেডুলা অবলংগাটায় জড়ো হয়। মেডুলা অবলংগাটা তথ্যগুলো হৃৎপেশি, কার্ডিয়াক পেসমেকার, দেহের ধমনিকা বা আর্টারিওল (ধমনির সূক্ষ্ম শাখা) ও শিরায় প্রেরণ করে। ফলে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় ও সজোরে সঙ্কুচিত হয় এবং ধমনির রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

CamScanner

২. নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (Low-Pressure Baroreceptors) বা আয়তন রিসেপ্টর (Volume Receptors) বা কার্ডিওপালমোনারি ব্যারোরিসেপ্টর (Cardiopulmonary Baroreceptors) : বড় বড় সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি রক্তবাহিকা এবং ডান অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরের ব্যারোরিসেপ্টরগুলো এ ধরনের। এসব রিসেপ্টর রক্তের আয়তন (blood volume) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। রক্তের আয়তন কমে গেলে রক্তচাপও কমে যায়। তখন আয়তন রিসেপ্টর মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস-এ বার্তা প্রেরণ করে। ফলে পিটুইটারি গ্রন্থির নিউরোহাইপোফাইসিস কর্তৃক অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন বা ভ্যাসোপ্রেসিন ক্ষরণ বেড়ে যায়। উক্ত হরমোন বৃক্কনালিকায় পানি পুনঃশোষণ বাড়িয়ে রক্তের আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে রক্তচাপ বাড়ায়। ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন সরাসরি রক্তনালিকার সঙ্কোচন ঘটিয়েও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। রক্তের আয়তন তথা চাপ কমে গেলে স্বয়ংক্রিয় বা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উদ্দীপ্ত হওয়ায় বৃক্কের অন্তর্বাহী ধমনির জাক্সটা-গ্লোমেরুলার কোষ (juxtaglomerular cell) থেকে রেনিন (renin) এনজাইম ক্ষরণ বেড়ে যায়। রেনিন এনজাইমের কার্যকারিতায় কয়েকটি জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তের আয়তন বাড়িয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ আয়তন রিসেপ্টরের প্রভাব রয়েছে রক্ত সংবহন ও রেচন উভয় তন্ত্রে।

মানবদেহের রক্ত সংবহন (Blood Circulation of Human Body)

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ ধরনের (closed type)। অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। তাছাড়া মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রে দ্বি-চক্রীয় সংবহন (double circulation) অর্থাৎ সিস্টেমিক (systemic) ও পালমোনারি (pulmonary) চক্র দেখা যায়। মানবদেহে চার প্রক্রিয়ায় রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা– ১. সিস্টেমিক, ২. পালমোনারি, ৩. পোর্টাল এবং ৪. করোনারি। নিচে এসব প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)

যে সংবহনে রক্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বিভিন্ন রক্ত বাহিকার মাধ্যমে অঙ্গগুলোতে পৌঁছায় এবং অঙ্গ থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। সব সিস্টেমিক ধমনির উদ্ভব হয় অ্যাওর্টা (aorta) বা মহাধমনি থেকে, আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত প্রথমে অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে ধমনিতে প্রবেশ করে। পরে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গের ধমনিকা (arteriole) ও কৈশিকনালির (capillaries) রক্ত জালিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রক্ত পুনরায় সংগৃহীত হয়ে উপশিরার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রক্ত পরে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা (উর্ধ্ব মহাশিরা) ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা (নিম্ন মহাশিরা) দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে গমন করে। এভাবে সিস্টেমিক সংবহন সমাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসতে সিস্টেমিক সংবহনের সময় লাগে ২৫–৩০ সেকেন্ড।

কাজ : সিস্টেমিক সংবহনে রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত কৈশিকজালিকা অতিক্রমকালে কোষে O_2, খাদ্যসারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এবং একই সাথে কোষে সৃষ্ট CO_2, রেচন পদার্থ ইত্যাদি কোষ থেকে অপসারিত হয়।

বাম ভেন্ট্রিকল→ অ্যাওর্টা→টিস্যু ও অঙ্গ→ মহাশিরা (ভেনাক্যাভা)→ ডান অ্যাট্রিয়াম→ডান ভেন্ট্রিকল।

২. পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)

যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে পালমোনারি বা ফুসফুসীয় সংবহন বলে। পালমোনারি সংবহনের শুরু হয় পালমোনারি ধমনি থেকে, আর পালমোনারি ধমনির উদ্ভব ঘটে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে। ডান ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। এরপর রক্ত ধমনিকা (arteriole) হয়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত

CamScanner

কৈশিকনালিতে উপস্থিত হয়। কৈশিকনালি থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ক্ষুদ্রতর শিরা বা ভেনিউল (venule) এবং অবশেষে ৪টি (প্রতি ফুসফুস থেকে ২টি) পালমোনারি শিরার মাধ্যমে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে।

ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি → ফুসফুস → পালমোনারি শিরা → বাম অ্যাট্রিয়াম → বাম ভেন্ট্রিকল।

কাজ : এ সংবহনের মাধ্যমে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেখানে অ্যালভিওলাসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে ফলে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

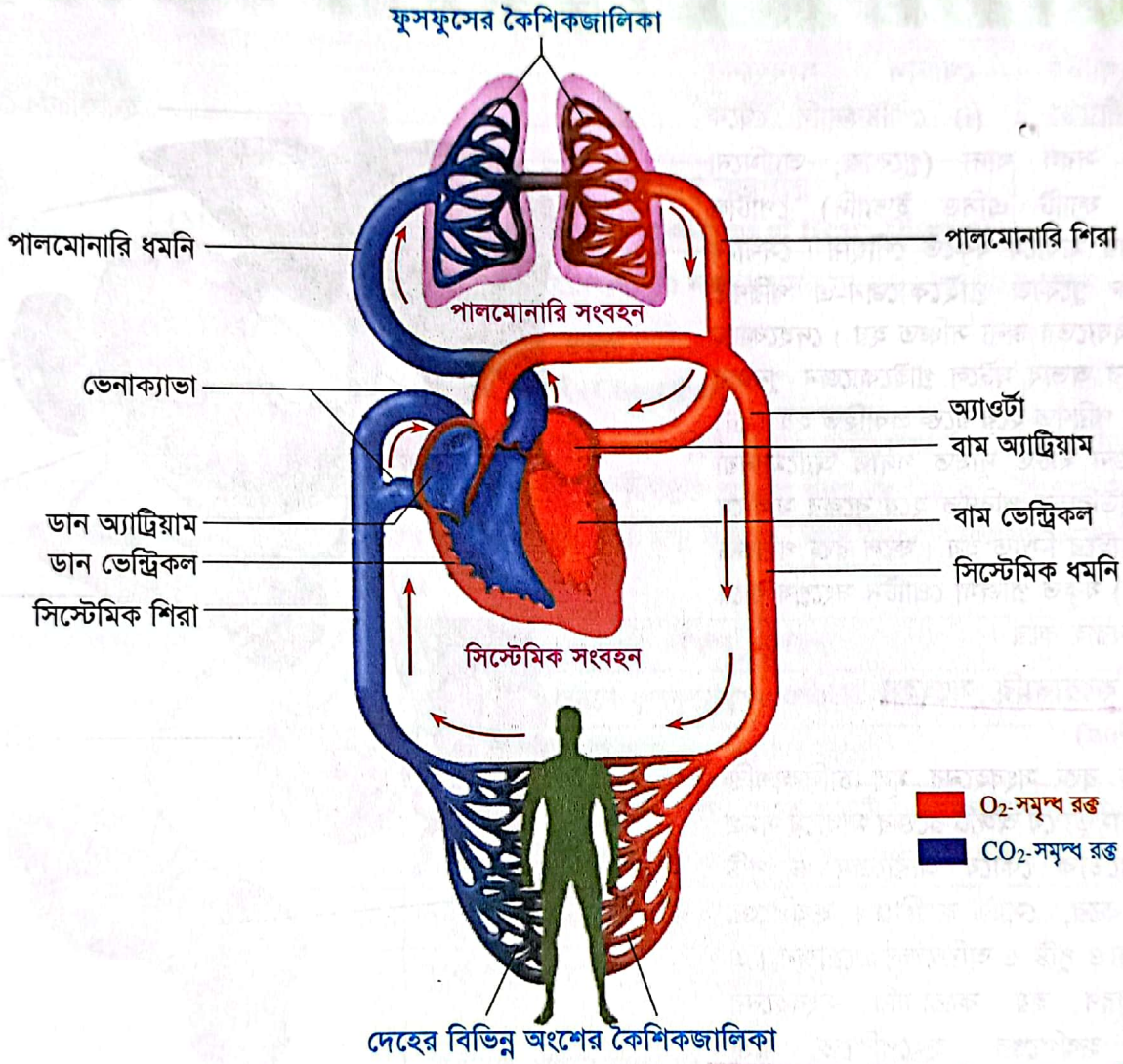

চিত্র ৪.২৭ : মানবদেহের রক্ত সংবহন

৩. পোর্টাল সংবহন (Portal circulation)

সিস্টেমিক ও পালমোনারি এ দুটি সম্পূর্ণ সংবহন চক্র ছাড়াও অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রক্ত চলার পথে কিছুটা পার্শ্বপথ অনুসরণ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গের কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় জালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে **পোর্টাল সংবহন** বলে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সাধারণত **হেপাটিক** (hepatic) এবং **রেনাল** (renal)-এ দুধরনের পোর্টাল সংবহন দেখা যায়। তবে রেনাল পোর্টাল সংবহন মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অনুপস্থিত।

CamScanner

হেপাটিক (যকৃত) পোর্টাল সংবহন: পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র ও প্লীহা থেকে কৈশিকজালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** (hepatic portal vein)-র ভিতর দিয়ে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে **হেপাটিক পোর্টাল সংবহন** বলে। যকৃতে পৌঁছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা পুনরায় কৈশিকজালিকায় বিভক্ত হয়। এসব কৈশিকজালিকা পরে একত্রীভূত হয়ে **হেপাটিক শিরা** (hepatic vein) গঠন করে এবং এর মাধ্যমে রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় বাহিত হয়। সেখান থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়।

পৌষ্টিক অঙ্গসমূহ→হেপাটিক পোর্টাল শিরা→যকৃত→হেপাটিক শিরা→ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা→ হৃৎপিণ্ড।

হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের প্রয়োজনীয়তা : (i) পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য (গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি) পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে পৌঁছায়। সেখানে অতিরিক্ত গ্লুকোজ **গ্লাইকোজেন**-এ পরিণত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়। দেহকোষে গ্লুকোজের অভাব ঘটলে গ্লাইকোজেন পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়। (ii) নাইট্রোজেন ঘটিত দূষিত পদার্থ অ্যামোনিয়া যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ফলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। (iii) যকৃত প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ করে রক্তে সরবরাহ করে।

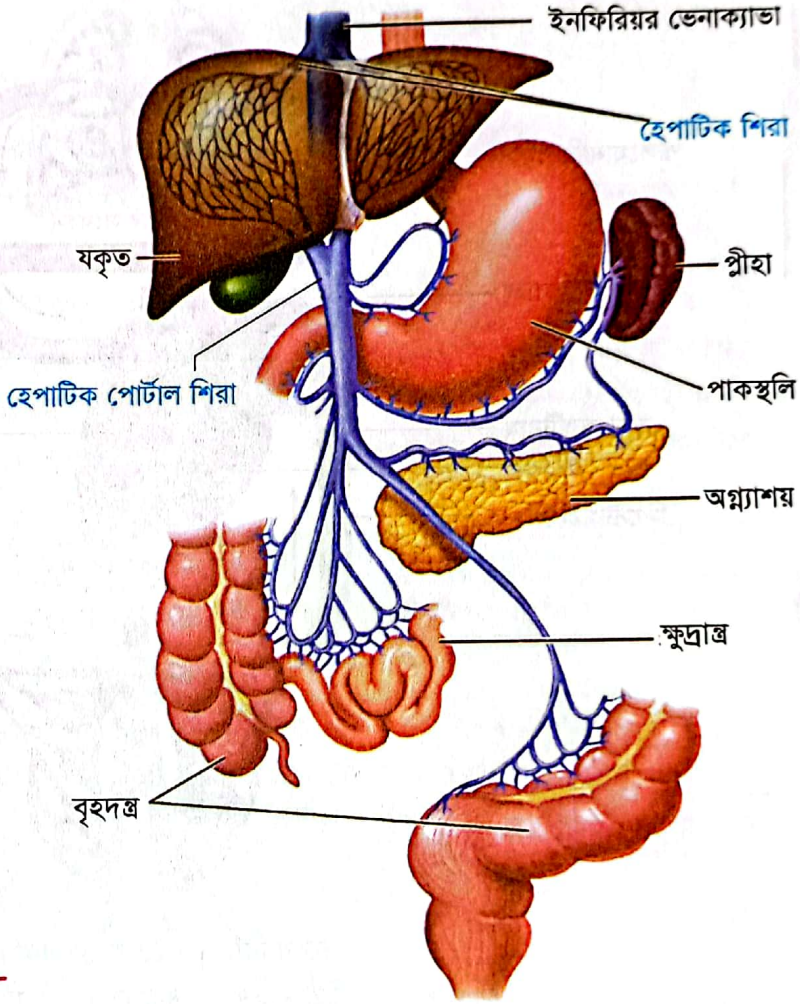

চিত্র ৪.২৮ : হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র

৪. করোনারি সংবহন (Coronary circulation)

দেহে রক্ত সংবহনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আমৃত্যু যে অঙ্গটি রক্তের মাধ্যমে সমগ্র দেহের প্রত্যেক কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে, সেটি **হৃৎপিণ্ড**। হৃৎপিণ্ডের নিজের জন্যও পুষ্টি ও অক্সিজেন প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণ হয় করোনারি সংবহনের মাধ্যমে। হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশিতে রক্ত সঞ্চালনকারি সংবহনকে **করোনারি রক্ত সংবহন** বলে।

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সঞ্চালিত হয় না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া থেকে সৃষ্ট **করোনারি ধমনির** মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2–সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর থেকে CO_2–সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

সিস্টেমিক ধমনি → করোনারি ধমনি → হৃৎপ্রাচীর → করোনারি শিরা → ডান অ্যাট্রিয়াম।

CamScanner

সিস্টেমিক এবং পালমোনারি সংবহনে পার্থক্য	
সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)	**পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)**
১. রক্তের গতিপথ বাম ভেন্ট্রিকল থেকে দেহটিস্যু এবং দেহটিস্যু থেকে ডান অ্যাট্রিয়াম।	১. রক্তের গতিপথ ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুস এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়াম।
২. এ সংবহনে ধমনি O_2-সমৃদ্ধ রক্ত এবং শিরা CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	২. এ সংবহনে পালমোনারি ধমনি CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ও পালমোনারি শিরা O_2-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।
৩. দেহটিস্যুতে পুষ্টি সরবরাহ করে।	৩. অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য ফুসফুসে গমন করে।
৪. রক্তচাপ বেশি।	৪. রক্তচাপ তুলনামূলকভাবে কম।

হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় (Measures to be taken in different conditions of Heart Disease)

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের হৃৎপিণ্ডে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। হৃৎপিণ্ডের সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য কারণেও বুকে ব্যথা হতে পারে।

বুকের ব্যথা (Chest Pain)

নানা কারণে বুকে ব্যথা হতে পারে। সাধারণত মানুষের কাছে বুকে ব্যথার অর্থই হচ্ছে কোনো না কোনো ধরনের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া। চিকিৎসকও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি আমলে নিয়ে রোগীর কষ্ট উপশমে সচেষ্ট হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, হৃদরোগসংক্রান্ত বুক ব্যথা নয়, ব্যথা ভিন্ন কারণে। নিচে হৃদরোগ বহির্ভূত কয়েকটি সাধারণ বুক ব্যথার নাম ও কারণ উল্লেখ করা হলো।

বুক ব্যথার প্রকারভেদ	লক্ষণ / কারণ
১. প্লিউরিসি (Pleurisy)	জীবাণুর সংক্রমণে ফুসফুসের আবরণে (প্লিউরিটিস) প্রদাহ।
২. নিউমোনিয়া (Pneumonia)	ফুসফুসে জীবাণুর সংক্রমণ; প্ল্যুরাল যন্ত্রণা।
৩. পালমোনারি এমবোলিজম (Pulmonary embolism)	শ্রোণিদেশ বা নিম্নাঙ্গের শিরা থেকে জমাট রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ; পালমোনারি ইনফার্কশন সৃষ্টি; তীব্র বুক ব্যথা ও কাশি।
৪. কস্টোকন্ড্রাইটিস (Costochondritis)	পর্শুকা ও পর্শুকার সম্মুখস্থ তরুণাস্থির সংযোগস্থলে প্রদাহ; দীর্ঘকালীন বুক ব্যথা।
৫. পর্শুকার ভাঙ্গন, পেশিটান (Rib fractures, Muscle strain)	বুকে তীব্র ব্যথা; নড়া-চড়া, কাশি দেয়া কষ্টকর।
৬. স্নায়ুতে চাপ (Nerve compression)	স্নায়ুমূলে হাড়ের চাপ; বুক ও উর্ধ্ববাহুতে ব্যথা।
৭. পিত্ত পাথুরি (Gall stones)	পিত্তথলিতে পাথর হলে বুক, পিঠ ও উদরের উপরের অংশে ব্যথা।
৮. দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত (Anxiety and Panic Attacks)	দুশ্চিন্তা, অবসন্নতা ও আতঙ্কগ্রস্ত হলে কয়েক মিনিট থেকে কয়েকদিন বুকে ব্যথা; ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, মাথা ঝিমঝিম করা, হতবুদ্ধি হওয়া।

কার্ডিওভাস্কুলার রোগ (Cardiovascular disease) বা হৃদরোগ (Heart disease)

হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালির রোগকে **কার্ডিওভাস্কুলার রোগ** বলা হয়। কার্ডিওভাস্কুলার রোগকে **হৃদরোগ**-ও বলে। কার্ডিওভাস্কুলার রোগ বা হৃদরোগ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো **করোনারি ধমনি রোগ** বা **করোনারি হৃদরোগ**, **কার্ডিওমেগালি** (cardiomegaly; হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া), **ভালভুলার হার্ট ডিজিজ** (valvular heart disease; এক বা

CamScanner

একাধিক হৃদকপাটিকা অকার্যকর), **কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ** (congenital heart disease; জন্মগত হৃৎপিণ্ডের রোগ), **পেরিকার্ডাইটিস** (pericarditis; পেরিকার্ডিয়ামের প্রদাহ), **কার্ডিওমায়োপ্যাথি** (cardiomyopathy; হৃৎপেশির রোগ), **রিউম্যাটিক হৃদরোগ** (rheumatic heart disease; স্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রিউম্যাটিক জ্বর এর কারণে হৃৎপেশি এবং ভালভ এর রোগ) ইত্যাদি।

কার্ডিওভাস্কুলার রোগের মধ্যে অন্যতম হলো **করোনারি হৃদরোগ** (coronary heart disease)। হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনির সংকীর্ণতার ফলে হৃৎপেশিতে পুষ্টি এবং অক্সিজেন সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **করোনারি হৃদরোগ** বলে। করোনারি হৃদরোগের অপর নাম **ইস্কিমিয়া** (ischaemia)। **অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যাটাক** এবং **হার্ট ফেলিওর** করোনারি ধমনির অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্ট করোনারি হৃদরোগ।

কার্ডিওভাস্কুলার রোগ তথা **করোনারি হৃদরোগ** এর প্রধান কারণ হলো ধমনি গহ্বর সরু হয়ে যাওয়া। ধমনি সরু হয় **অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস** (atherosclerosis) দ্বারা। অধিক কোলেস্টেরল সম্পন্ন হলুদ ফ্যাটি এসিড করোনারি ধমনির **এন্ডোথেলিয়াম**-এর গাত্রে জমা হয়ে অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস এর শুরু হয়। পরে কোলেস্টেরলে আঁশ যুক্ত হয়ে এবং শক্ত হয়ে **প্লাক** (plaque) সৃষ্টি করে। প্লাক আকৃতিতে বৃদ্ধি পেয়ে ধমনি গহ্বরকে সরু করে এবং রক্ত চলাচালে বাধা সৃষ্টি করে।

১. অ্যানজাইনা (Angina) বা হৃদশূল

নানা কারণে বুকে ব্যথা হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃৎপিন্ডজনিত বুক ব্যথা। হৃৎপেশি যখন O_2-সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ পায় না তখন বুক নিষ্পেষিত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্বস্তি অনুভূত হলে সে ধরনের বুক ব্যথাকে **অ্যানজাইনা** বা **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** (angina / angina pectoris) বলে। অ্যানজাইনাকে সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা হয়।

অ্যানজাইনার প্রকার (Types of Angina)

সাধারণত তিনি ধরনের অ্যানজাইনা হয়ে থাকে, যথা–

i. **সুস্থিত অ্যানজাইনা (Stable Angina) :** এক্ষেত্রে বুকের ব্যথা অনুভূত হয় কেবল পরিশ্রম কিংবা চরম আবেগীয় বিষন্নতার কারণে। বিশ্রাম নিলে এ ব্যথা চলে যায়।

ii. **অস্থিত অ্যানজাইনা (Unstable Angina) :** বিশ্রামের সময় বুকের ব্যথা অনভূত হলে তাকে **অস্থিত অ্যানজাইনা** বলা হয়। এ ব্যথা প্রায়শই হয়ে থাকে এবং অনেক সময়ব্যাপি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এ ধরনের অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ।

iii. **প্রিনজমেটাল অ্যানজাইনা (Prinzmetal Angina) :** বিশ্রামের সময় কিংবা ঘুমের সময় কিংবা ঠাণ্ডার কারণে এ ধরনের অ্যানজাইনা দেখা দেয়।

অ্যানজাইনার লক্ষণ (Symptoms of Angina)

১. উরঃফলক বা স্টার্নামের (sternum) পিছনে বুকে ব্যথা হওয়া।
২. ব্যায়াম বা অন্য শারীরিক কাজে, মানসিক চাপ, অতি ভোজন, শৈত্য বা আতংকে বুকে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা ৫–৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।
৩. অ্যানজাইনা গলা, কাঁধ, চোয়াল, বাহু, পিঠ এমনকি দাঁতেও ছড়াতে পারে।
৪. অনেক সময় ব্যথা কোত্থেকে আসছে তাও বোঝা যায় না।
৫. বুকে জ্বালাপোড়া, চাপ, নিষ্পেষণ বা আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হয়ে অস্বস্তির প্রকাশ ঘটায়।
৬. বুকে ব্যথা ছাড়াও হজমে গন্ডগোল ও বমি ভাব হতে পারে।
৭. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপানো দেখা দিতে পারে।

CamScanner

অনেক রোগী অ্যানজাইনা টের পায় না, তবে কাঁধ ও বাহু ভারী হয়ে আসে। বুকে ব্যথার সাথে সাথে ঘাম হয়, মাথা ঝিমঝিম করে বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। রোগী চিন্তান্বিত থাকে, মাথা ঝুলে থাকে। সারাদিন দুর্বল ও পরিশ্রান্ত থাকে এবং তখন সহজ কাজও কঠিন মনে হয়।

করণীয় / প্রতিকার (Control)

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং তা ধরে রাখাই হচ্ছে অ্যানজাইনা প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এজন্যে কিছু বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই, যেমন-বয়স, লিঙ্গভেদ, হৃদরোগ ও অ্যানজাইনার পারিবারিক ইতিহাস। যে সব বিষয় আমাদের নাগালে তার মধ্যে রয়েছে:

১. রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ECG ও ইকোকার্ডিওগ্রামের মাধ্যমে ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ খেতে হবে।
২. রোগের অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক অপারেশন অথবা এনজিওগ্রামের পরামর্শ দিতে পারেন।
৩. এছাড়াও ধূমপান ও মদপান পরিহার করতে হবে।
৪. নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম বা হাঁটা-চলা, কায়িক পরিশ্রম করা, আলস্য পরিহার, স্থূলতা রোধ করা ইত্যাদি।
৫. সুষম ও হৃদ-বান্ধব খাবার খেতে হবে।
৬. ডায়োবেটিস, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বনে অ্যানজাইনাল ব্যথার সম্ভাবনা কমে।

২. হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack or Myocardial Infarction)

হৃৎপেশির সুস্থতার জন্য ক্রমাগতভাবে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ জরুরি। করোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন–সমৃদ্ধ রক্ত পেশিতে পৌঁছায়। চর্বি জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন প্রভৃতি করোনারি ধমনির অন্তর্গাত্রে জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির **প্লাক** (plaques) গঠন করে। একে **করোনারি অ্যাথেরোমা** (coronary atheroma) বলে। প্লাকের বহির্ভাগ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠে। এভাবে প্লাক শক্ত হতে হতে যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন এগুলো বিদীর্ণ হয়। অণুচক্রিকা জমা হয়ে প্লাকের চতুর্দিকে তখন রক্ত জমাট বাঁধাতে শুরু করে। রক্ত জমাট বাঁধার কারণে করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপেশিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়, ফলে হৃৎপেশি ধ্বংস হয় বা মরে যায় এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রচলিত ভাষায় একেই **হার্ট অ্যাটাক** বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে Heart Attack বলতে কিছু নেই। এটি আসলে **মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন** (myocardial infarction; 'মায়োকার্ডিয়াল' অর্থ হৃৎপেশি, আর 'ইনফার্কশন' অর্থ অপর্যাপ্ত রক্ত প্রবাহের কারণে টিস্যুর মৃত্যু)।

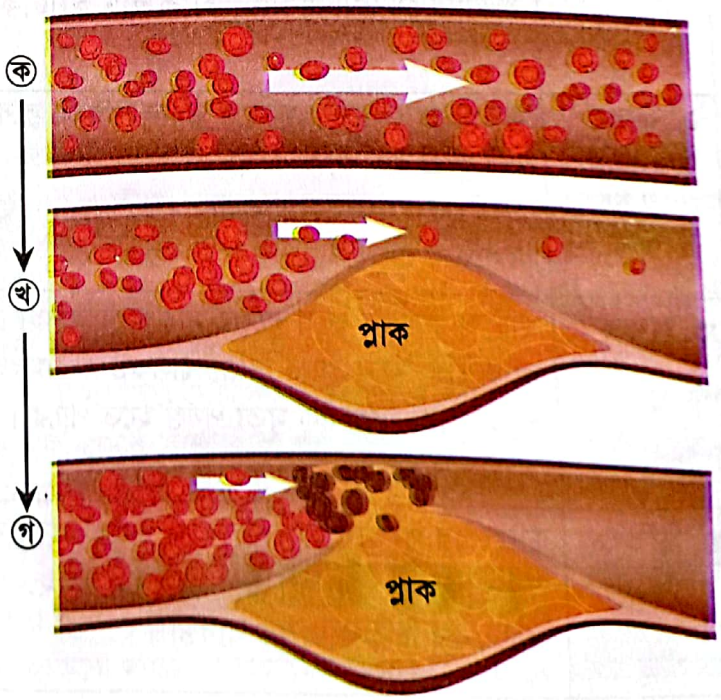

চিত্র ৪.২৯ : প্লাক গঠন

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হওয়া থেকে হার্ট অ্যাটাকে পরিসমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়। এ সময়ের ভিতর বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

১. **বুকে ব্যথা (Chest-pain) :** বুকের ঠিক মাঝখানে অস্বস্তি হওয়া যা কয়েক মিনিট থাকে, চলে যায় আবার ফিরে আসে। বুকে অসহ্য চাপ, মোচড়ান, আছড়ান বা ব্যথা অনুভূত হয়।

CamScanner

২. **ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্যান্য অংশে অস্বস্তি (Discomfort in other areas of the upper body) :** এক বা উভয় বাহু, পিঠ, গলা, চোয়াল বা পাকস্থলির উপরের অংশে অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভব।

৩. **ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (Shortness of breath) :** বুকে অস্বস্তির সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে। অনেক সময় বুকে অস্বস্তি হওয়ার আগেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে।

৪. **বমি-বমি ভাব (Nausea) বা বমি হওয়া :** পাকস্থলিতে অস্বস্তির সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম করা অথবা ঠান্ডা ঘাম বেরিয়ে যাওয়া।

৫. **ঘুমে ব্যাঘাত (Sleep disturbance) :** ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা, নিজেকে শক্তিহীন বা শ্রান্ত বোধ করা।

প্রতিরোধ

১. ঋতুকালীন টাটকা ফল ও সবজি খেতে হবে।
২. চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।
৩. **বডি-মাস ইন্ডেক্স** (Body Mass Index, BMI) মেনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।
৪. সঠিক ওজন, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম (যেমন- প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটা ইত্যাদি) করতে হবে।
৫. ধূমপায়ী হলে অবশ্যই ধূমপান ত্যাগ করতে হবে, অধূমপায়ী হলে ধূমপান না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।
৬. জীবনাভ্যাসে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ রাখতে হবে।
৭. কোলেস্টেরল, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৮. চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে বা বন্ধ করতে হবে।
৯. বছরে অন্তত একবার (সম্ভব হলে দুবার) সমগ্র দেহ চেকআপের ব্যবস্থা করতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক

সাধারণ মানুষের মধ্যে **হার্ট অ্যাটাক** ও **স্ট্রোক** সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। অনেক সময় দুটোকে এক করে দেখা হয়। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো।

বিষয়	হার্ট অ্যাটাক	স্ট্রোক
১. সংজ্ঞা	হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির ভিতর তঞ্চন পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টির ফলে রক্ত সরবরাহ না পেয়ে হৃৎপেশি মরে যাওয়ায় যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাকে **হার্ট অ্যাটাক** বলে।	মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী কোনো ধমনির ভিতরে তঞ্চন পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টির ফলে অথবা রক্তনালি ছিড়ে গেলে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাকে **স্ট্রোক** বলে।
২. কারণ	হৃৎপিণ্ডের কোনো ধমনিতে তঞ্চন পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টি হলে হার্ট অ্যাটাক হয়।	মস্তিষ্কের কোনো ধমনিতে তঞ্চন পিণ্ড বা উচ্চ রক্তচাপের দরুন মস্তিষ্কের কোনো ধমনি ফেটে গেলে অথবা মস্তিষ্কের কোনো ধমনির অনিয়ন্ত্রিত সঙ্কোচন বা আপেক্ষের কারণে স্ট্রোক হয়।
৩. লক্ষণ	হার্ট অ্যাটাকের ফলে বুকের মাঝখানে অসহ্য চাপ বা অস্বস্তি, বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, শ্বাসকষ্ট বা দমবদ্ধতা, শীতল ঘাম, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।	স্ট্রোকের ফলে স্মৃতিভ্রংশ, বাকলোপ, চেতনালোপ, প্যারালাইসিস, নাক ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ, মুখ বাকা হয়ে যাওয়া, এমনকি আকস্মিক মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
৪. চিকিৎসা	ডাক্তারের পরামর্শ মতো কার্যকর ওষুধ সেবন করা। এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি ইত্যাদি হলো হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা।	ডাক্তারের পরমার্শ মতো কার্যকর ওষুধ সেবন করা। প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি নেয়া ইত্যাদি হলো স্ট্রোকের চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা।

CamScanner

৩. হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)

হৃৎপিন্ড যখন দেহের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রক্তের যোগান দিতে পারে না তখন এ অবস্থাকে হার্ট ফেইলিউর বলে। অনেক সময় হৃৎপিন্ড রক্তে পরিপূর্ণ হতে না পারায়, কখনওবা হৃৎপ্রাচীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকায় এমনটি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে উভয় সমস্যাই একসঙ্গে দেখা যায়। অতএব হার্ট ফেইলিউর মানে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে গেছে, বা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তা নয়। তবে হার্ট ফেইলিউরকে হৃৎপিন্ডের একটি মারাত্মক অবস্থা বিবেচনা করে সুচিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

হার্ট ফেইলিউরের কারণ

বিভিন্ন কারণে হার্ট ফেইলিউর হতে পারে। যেমন–

১. হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের জন্য।
২. উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনের জন্য।
৩. হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার রোগ হলে।
৪. ইসকেমিক হৃদরোগ হলে অর্থাৎ করোনারি ধমনিতে ব্লক হলে।
৫. হৃৎস্পন্দনের ছন্দোপতন হলে।
৬. অতিমাত্রায় রক্ত শূন্যতার জন্য।
৭. ধূমপান ও মদ্যপানের জন্য।
৮. অত্যধিক মানসিক চাপ, বার্ধক্যজনিত কারণে, জেনেটিক কারণে ইত্যাদি।

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ

১. সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এমনকি ঘুমের মধ্যেও শ্বাসকষ্টে ভোগা এবং ঘুমের সময় মাথার নিচে দুটি বালিশ না দিলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
২. সাদা বা গোলাপি রঙের রক্তমাখানো মিউকাসসহ স্থায়ী কাশি বা ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস।
৩. শরীরের বিভিন্ন জায়গার টিস্যুতে তরল জমে ফুলে উঠে।
৪. পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফীত হয়ে যায়। জুতা পরতে গেলে হঠাৎ আঁটসাট মনে হয়।
৫. প্রতিদিন সব কাজে, সবসময় ক্লান্তিভাব। বাজার-সদাই করা, সিঁড়ি দিয়ে উঠা, কিছু বহন করা বা হাঁটা সবকিছুতেই শ্রান্তিভাব।
৬. পাকস্থলি সব সময় ভরা মনে হয় কিংবা বমি ভাব থাকে।
৭. হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত হয় মনে হবে যেন হৃৎপিন্ড এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
৮. কাজ-কর্ম, চলনে অসামঞ্জস্যতা এবং স্মৃতিহীনতা প্রকাশ পায়।

হার্ট ফেইলিউরের প্রতিকার

হার্ট ফেইলিউর থেকে মুক্তি পেতে হলে স্বাস্থ্য সচেতন ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করতে হবে, কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন– (i) হৃদরোগ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস ও স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (ii) অতিরিক্ত কোলেস্টরল যুক্ত খাবার বর্জন করা, স্বল্প আহারের অভ্যাস করা ও খাদ্যে লবণ কম খাওয়া। (iii) নিয়মিত ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রম করা। (iv) ধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করা। (v) ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ সেবন করা। (vi) প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে চিকিৎসকের পরামর্শে ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। পরীক্ষাগুলো যেমন–ইকোকার্ডিওগ্রাম, বুকের এক্স-রে, ইলেকট্রোফিজিওলজি, অ্যানজিওগ্রাফি, বিভিন্ন প্রকার রক্ত পরীক্ষা, দেহে তরলের ভারসাম্য ও দেহের ওজন পর্যবেক্ষণ। (vii) প্রয়োজনে চিকিৎসক হার্ট ফেইলিউরের কবল থেকে রক্ষা পেতে সার্জারি বা শল্য চিকিৎসার নির্দেশ দিয়ে থাকেন– যেমন করোনারি বাইপাস সার্জারি, হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা মেরামত বা রিং বসানো, পেসমেকার বসানো ইত্যাদি।

করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ (Risk Factors of Coronary Heart Disease)

১. বয়স : বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ধমনির সংকীর্ণতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
২. লিঙ্গ : পুরুষেরা সাধারণত করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকিতে থাকে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজের পর ঝুঁকি বাড়ে।

CamScanner

৩. **পারিবারিক ইতিহাস :** হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস রোগ সৃষ্টির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষত বাবা বা ভাই এর ক্ষেত্রে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে। মা বা বোনের ক্ষেত্রে ৬৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ঝুঁকি থাকে।

৪. **ধূমপান :** নিকোটিন রক্তনালির সঙ্কোচন ঘটায় এবং CO রক্তনালির অন্তঃপর্দাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (atherosclerosis) এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৫. **উচ্চ রক্তচাপ :** নিয়ন্ত্রণহীন উচ্চ রক্তচাপের কারণে রক্তনালির পুরুত্ব বাড়ে এবং ঋজুতা বৃদ্ধি পায় ফলে নালির সংকীর্ণতা ঘটে।

৬. **কোলেস্টেরলের উচ্চমাত্রা :** রক্ত কোলেস্টেরলের উচ্চমাত্রা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (atherosclerosis) সৃষ্টি করে।

৭. **ডায়াবেটিস :** ডায়াবেটিস করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

৮. **স্থূলতা :** স্থূলতা বা স্বাভাবিকের চেয়ে দেহের ওজন বৃদ্ধি পেলে ঝুঁকি বাড়ে।

৯. **শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা :** শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকলে রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

১০. **বিকিরণ চিকিৎসা :** ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রেডিয়েশন হৃদরোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা (The Concept of the Treatment of Heart Diseases)

হৃদরোগ নির্ণয়

নিচে বর্ণিত উপায়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হৃদরোগ নির্ণয় করতে পারেন।

১. চিকিৎসকগণ হার্ট বিটের হার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া, যকৃত বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখে হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।

২. বুকের X-ray করানোর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়।

৩. ইসিজি (Electrocardiogram) হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে (যেমন-হার্ট অ্যাটাক) সাহায্য করে।

৪. ইটিটি (Exercise Tolerance Test)-র সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বা কার্যক্ষমতা ভালোভাবে জানা যায়।

৫. রক্তের BNP (Brain Natriuretic Peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

৬. করোনারি এনজিওগ্রাম-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনো ব্লক আছে কিনা তা দেখা হয়।

৭. হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানা যায় MRI (Magnetic Resonance Imaging) পরীক্ষার মাধ্যমে।

৮. উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করে হৃদরোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৯. হার্ট অ্যাটাক হলে Troponion-I পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।

আধুনিক বিশ্বে হৃদরোগের গবেষণার ফসল হিসেবে বেশ কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। নিচে এমন কয়েকটি চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. হৃদস্পন্দক বা পেসমেকার (Pacemaker)

হৃৎপিন্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম-প্রাচীরের উপর দিকে অবস্থিত, বিশেষায়িত কার্ডিয়াক পেশিগুচ্ছে গঠিত ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত একটি ছোট অংশ যা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়ে হৃদস্পন্দন সৃষ্টি করে এবং স্পন্দনের ছন্দোময়তা বজায় রাখে তাকে **হৃদস্পন্দক** বা **পেসমেকার** বলে। মানুষের হৃৎপিন্ডে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (sino-atrial node) হচ্ছে পেসমেকার। এটি অকেজো বা অসুস্থ হলে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কম্পিউটারাইজড বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেহে স্থাপন করা হয় তাকেও পেসমেকার বলে। অতএব, পেসমেকার দুধরনের– একটি হচ্ছে হৃৎপিন্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপী সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SA নোড) যা প্রাকৃতিক পেসমেকার নামে পরিচিত; অন্যটি হচ্ছে যান্ত্রিক পেসমেকার, এটি অসুস্থ প্রাকৃতিক পেসমেকারকে নজরদারির মধ্যে রাখে। প্রাকৃতিক পেসমেকারের কার্যক্রম কার্ডিয়াক চক্রের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম (Artificial Pacemaker Activities)

অসুস্থ ও দুর্বল হৃৎপিণ্ডে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন হার ফিরিয়ে আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে বুকে বা উদরে চামড়ার নিচে স্থাপিত ছোট এক বিশেষ যন্ত্রকে পেসমেকার বলে। দেহকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে হলে

CamScanner

হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা বজায় ও নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত জরুরী। হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা পরিমাপের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে হৃৎস্পন্দনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর লয় বা দ্রুত গতিসম্পন্ন কিংবা অনিয়ত হলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক স্পন্দন হলে তাকে **অ্যারিথমিয়া** (arrhythmia) বলে। এমন অবস্থায় মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় বা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। প্রচন্ড অ্যারিথমিয়ায় দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পেসমেকার ব্যবহারে সব ধরনের অ্যারিথমিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বাকি জীবন সক্রিয় থাকা যায়। দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী William Chardack এবং Wilson Greatbatch, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন।

যান্ত্রিক পেসমেকারের গঠন

একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, কম্পিউটারাইজড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্সরযুক্ত কতকগুলো তার নিয়ে একটি পেসমেকার গঠিত। সেন্সরগুলোকে **ইলেকট্রোড** (electrode) বলে। ব্যাটারি জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে। ব্যাটারি ও জেনারেটর একটি পাতলা ধাতব বাক্সে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইলেকট্রোডগুলো হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কর্মকান্ড শনাক্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে।

পেসমেকারে অপরিরাহী আবরণযুক্ত (insulated) ১-৩টি তার থাকে। পেসমেকারের তারকে **লিড** (lead) বলে। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার (লিড) প্রবেশের ধরন অনুযায়ী পেসমেকার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

১. এক-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Single-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার বা লিড থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের শুধু ডান অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) বা ডান ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এ বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

২. দ্বি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Dual-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার (লিড) থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের দুটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

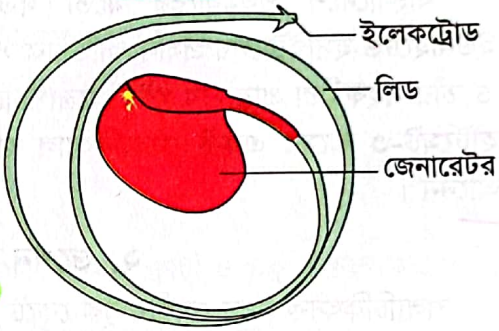

চিত্র ৪.৩০ : যান্ত্রিক পেসমেকার

৩. ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Triple-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার (লিড) থাকে যার একটি জেনারেটর থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে, আরেকটি ডান ভেন্ট্রিকলে এবং অন্যটি বাম ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে। এটি অত্যন্ত দুর্বল হৃৎপেশির হৃৎপিণ্ডে স্থাপন করা হয় (না হলে হার্ট ফেইলিউরের আশঙ্কা থাকে)। পেসমেকার এক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকলদুটিকে সংকোচন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহে উন্নতি ঘটায়।

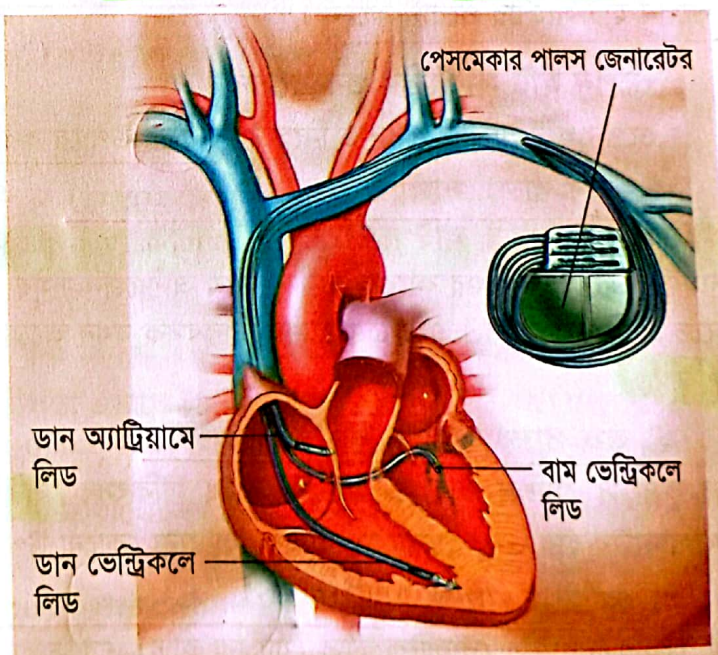

চিত্র ৪.৩১ : মানবদেহে যান্ত্রিক পেসমেকার স্থাপন (ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার)

পেসমেকার যেভাবে কাজ করে

জেনারেটরের কম্পিউটার-চিপ এবং হৃৎপিণ্ডে যুক্ত সেন্সরবাহী তার ব্যক্তির চলন, রক্তের তাপমাত্রা, শ্বসন ও বিভিন্ন শারীরিক কর্মকাণ্ড মনিটর করে। প্রয়োজনে কর্মকান্ডের ধারা অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডকে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে পেসমেকার ঠিক করে দেয় কোন ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ লাগবে এবং কখন লাগবে। যেমন-পেসমেকার ব্যক্তির ব্যায়াম করার বিষয়টি

CamScanner

বুঝতে পেরে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। এসব উপাত্ত পেসমেকারে রক্ষিত থাকে যা দেখে চিকিৎসকেরা পেসমেকারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন। কম্পিউটারের সাহায্যেই যেহেতু পেসমেকারের প্রোগ্রামে পরিবর্তন আনা যায় তাই পেসমেকারে ছুরি-কাঁচি চালানোর প্রয়োজন পড়ে না। পেসমেকারের ব্যাটারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মেয়াদ থাকে ৭–১০ বছরের মতো।

মেকানিক্যাল হার্ট (Mechanical Heart)

অনেক ক্ষেত্রে কিছু রোগীর দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাদের হৃৎপিণ্ড প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ রকম রোগীর একমাত্র চিকিৎসা হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন। তবে প্রতিস্থাপনের জন্য সুস্থ হৃৎপিণ্ড না পাওয়া গেলে তখন **মেকানিক্যাল হার্ট ইমপ্ল্যান্ট বা লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসিস্ট ডিভাইস** (Left Ventricular Assist Device) স্থাপন করা হয়। এতে রোগীর হৃৎপিণ্ড কিছুটা বিশ্রাম পায় এবং শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। উন্নত দেশগুলোতে এধরনের ইমপ্ল্যান্ট করা হয়ে থাকে।

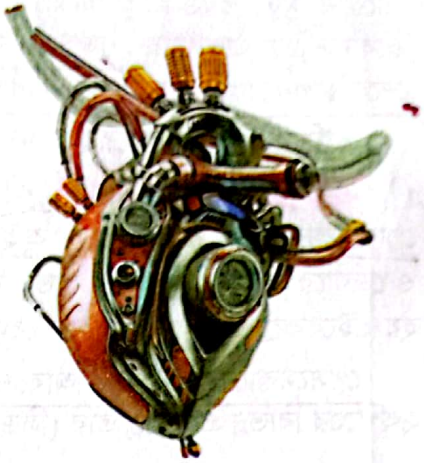

চিত্র ৪.৩২ : মেকানিক্যাল হার্ট

বাংলাদেশে মেকানিক্যাল হার্ট প্রতিস্থাপন

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো গত ০২/০৩/২০২২ তারিখে ঢাকার ইউনাইটেড হসপিটালের প্রধান কার্ডিয়াক সার্জন **প্রফেসর ডা. জাহাঙ্গীর কবির** ও তাঁর সহকর্মীরা প্রায় চার ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একজন মহিলা রোগীর (বয়স-৪২) হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকলে **হার্টমেট-৩** নামের একটি মেকানিক্যাল হার্ট স্থাপন করেন এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন।

২. ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

শল্যচিকিৎসক যখন রোগীর বুক কেটে উন্মুক্ত করে হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন তখন সে প্রক্রিয়াকে **ওপেন হার্ট সার্জারি** বলে। এটি একটি বড় শল্যচিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যা ও রোগ মুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্য সব চিকিৎসার পরও যদি হৃৎপিণ্ডে বড় ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়া উপায় থাকে না। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Wilfred G. Bigelow, ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োগ করেন।

ওপেন হার্ট সার্জারির প্রকারভেদ

ওপেন হার্ট সার্জারি প্রধানত নিচে বর্ণিত তিন উপায়ে করা হয়।

১. অন-পাম্প সার্জারি (On-pump surgery) : এ ধরনের সার্জারিতে একটি হৃদ-ফুসফুস মেশিনে যা **কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস** (cardiopulmonary bypass) নামে পরিচিত সেটি ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রটি সাময়িকভাবে হৃৎপিণ্ডের কাজের দায়িত্ব নিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পাম্প করে বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে প্রেরণ করে। এটি হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় শল্যচিকিৎসক যখন অস্ত্রোপচার করেন তখন হৃৎপিণ্ডে রক্তও থাকে না, হৃৎস্পন্দনও হয় না।

২. অফ-পাম্প সার্জারি বা বিটিং হার্ট (Off-pump surgery or Beating heart) : এ ধরনের সার্জারিতে হৃদ-ফুসফুস মেশিন ব্যবহৃত হয় না, বরং চিকিৎসক সক্রিয় হৃৎস্পন্দনরত হৃৎপিণ্ডেই অস্ত্রোপচার করেন। তবে হৃৎস্পন্দনের হার ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে সামান্য মন্থর করে রাখা হয়।

৩. রোবট-সহযোগী সার্জারি (Robot-assisted surgery) : এ ধরনের সার্জারিতে শল্যচিকিৎসক বিশেষ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত (যান্ত্রিক হাত)-এর সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। চিকিৎসক কম্পিউটার সার্জারির ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে পান এবং কাজ সম্পন্ন করেন। এ ধরনের সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিক হয়ে থাকে।

CamScanner

ওপেন হার্ট সার্জারি পদ্ধতি

একজন কার্ডিওভাস্কুলার শল্যচিকিৎসকের অধীনে একটি শল্যচিকিৎসক দল ওপেন হার্ট সার্জারির মতো জটিল অস্ত্রোপচার পরিচালনা করেন। সার্জারির শুরুতে চিকিৎসকের নির্দেশে সাধারণ অ্যানেসথেসিয়া (general anesthesia) কিংবা স্নায়ুবন্ধক অ্যানেসথেসিয়া (nerve block anesthesia) প্রয়োগ করা হয়। সার্জারি শুরু হয় বুক ও স্টার্নাম কেটে বড়-সড় গর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে। তা না হলে রোগীর ভিতরটা ভালোমতো দেখা যায় না। অন-পাম্প সার্জারি হলে ওষুধ প্রয়োগে হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে দিয়ে **হৃদ-ফুসফুস মেশিন** (heart-lung machine)-এর সাহায্যে পাম্প করে সারা দেহে রক্তের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। সার্জারি শেষে মেশিন খুলে নেয়া হয়।

অন্যদিকে, করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি বা হৃৎকপাটিকা মেরামত বা পুনঃস্থাপন করার সময় সার্জন আর প্রচলিত বড় ধরনের কাটা-ছেঁড়া না করে বুকের মাঝামাঝি ছোট ফুটা করে তার ভিতরে ক্যামেরাযুক্ত যন্ত্র ঢুকিয়ে রোগীর অভ্যন্তরভাগ দেখেন মনিটরে। এ প্রক্রিয়ায় সার্জারি হলে সময় ও ব্যথা উভয়ই কম লাগে, সংক্রমণজনিত জটিলতাও কম হয়। রোগীর ব্যক্তিগত পছন্দ, শনাক্তকরণ, বয়স, অসুখের ইতিহাস, স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রভৃতির উপর এ ধরনের সার্জারি নির্ভর করে।

সাবধানতা বা ওপেন হার্ট সার্জারির পরে করণীয়

ওপেন হার্ট সার্জারির রোগীদের কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন–

১. রোগীকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (ICU) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা।
২. রোগীর বক্ষগহ্বরে সঞ্চিত তরল বের হওয়ার জন্য নমনীয় ২-৩টি নল লাগাতে হয়।
৩. চর্বিমুক্ত খাবার খাওয়া এবং ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা' সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা।
৪. রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা রাখা।
৫. নিয়ম মতো চলাফেরা করা।
৬. ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
৭. কোনো রকম শারীরিক অসুবিধা মনে হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরমার্শ নেয়া ও ওষুধ সেবন করা।

৩. করোনারি বাইপাস সার্জারি (Coronary Bypass Surgery)

এক বা একাধিক করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) রুদ্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ অব্যাহত রাখতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেহের অন্য অংশ থেকে (যেমন-পা থেকে) একটি সুস্থ রক্তবাহিকা (ধমনি বা শিরা) কেটে এনে রুদ্ধ ধমনির পাশে স্থাপন করে রক্ত সরবরাহের যে বিকল্প পথ সৃষ্টি করা হয় তাকে **করোনারি বাইপাস** বলে। করোনারি বাইপাস সৃষ্টির সামগ্রিক অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়াটিকে **করোনারি বাইপাস সার্জারি** বলা হয়।

করোনারি হৃদরোগ সৃষ্টির প্রধানতম কারণ হচ্ছে করোনারি ধমনির রুদ্ধতা। এর মূল কারণ ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীর ঘিরে ক্রমশ সঞ্চিত হওয়া উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে চর্বি পদার্থ। ধমনি প্রাচীরের এন্ডোথেলিয়ামে এগুলো জমা হয়। পরে এসব পদার্থে তন্তু পুঞ্জিভূত হয়ে শক্ত হতে শুরু করে এবং চুনময় পদার্থে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে **আর্টারিওস্ক্লেরোসিস** (arteriosclerosis) বলে। আর পুঞ্জিভূত পদার্থগুলোকে বলে **অ্যাথেরোমেটাস প্লাকস** (atheromatous plaques)। প্লাকসের আধিক্যের কারণে ধমনিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন হৃৎপেশি O_2-সমৃদ্ধ রক্ত না পেলে হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ এসব জটিলতা এড়াতে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সরবরাহ করার বিকল্প পথের সৃষ্টি করতে হয়। বাইপাস সড়কের মতো হৃৎপিন্ডে বাইপাস ধমনি নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়।

ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি ও ডায়াবেটিস প্রভৃতি ধমনি গাত্রে প্লাক জমার কাজ ত্বরান্বিত করে। তা ছাড়া, ৪৫ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ ও ৫৫ বছরের বেশি বয়সি নারীর ক্ষেত্রে কিংবা পরিবারের ইতিহাসে যদি করোনারি ধমনি সংক্রান্ত ব্যাধির নজির থেকে থাকে তাহলে আরও কম বয়সে সার্জারি করার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

যখন করোনারি ধমনির লুমেন ৫০–৭০% সংকীর্ণ হয় তখন থেকেই O_2-সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ হৃৎপেশিতে কমে যায়। বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। প্লাকের চূড়ায় যদি রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে পরিস্থিতি হার্ট অ্যাটাকের দিকে চলে যায়।

CamScanner

ধমনির লুমেন যদি ৯০–৯৯% সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন অস্থিত অ্যানজাইনা (unstable angina) ত্বরান্বিত হয়। এমন অবস্থায় করোনারি বাইপাস কার্যক্রম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

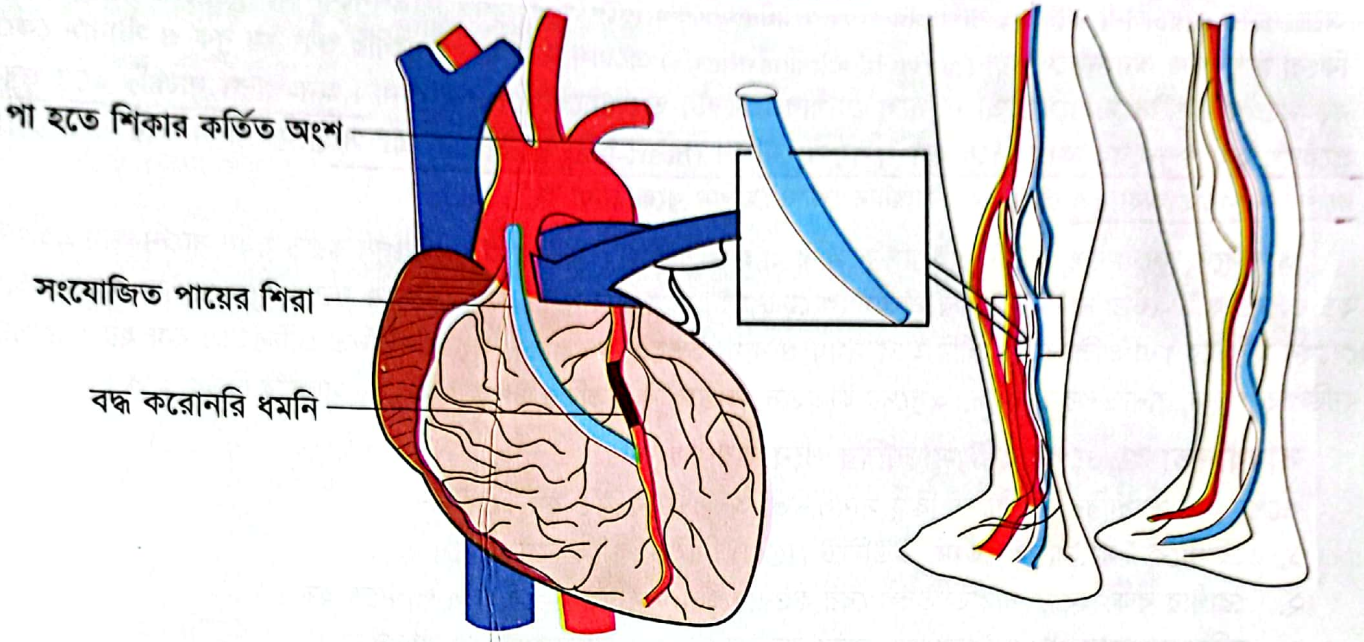

চিত্র ৪.৩৩ : করোনারি বাইপাস সার্জারি (বাম পা থেকে শিরা এনে করোনারি ধমনিতে সংযোজন)

করোনারি বাইপাস একটি জটিল প্রক্রিয়া। রোগ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় হৃদচিকিৎসক প্রথমে করোনারি ধমনির রোগের সঠিক অবস্থান, ধরন ও ব্যাপকতা নির্ণয় করেন। পরবর্তী ধাপে রোগীর হৃৎপিন্ড, বয়স, লক্ষণের ব্যাপকতা, অন্যান্য অসুখ-বিসুখের অবস্থা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি বিবেচনা করে হৃদ ও শল্যচিকিৎসক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। রুদ্ধ করোনারি ধমনিকে এড়িয়ে ভিন্নপথ নির্মাণ করতে বুক, হাত, পা ও তলপেট থেকে ধমনি সংগ্রহ করা হয়। কয়টি করোনারি ধমনি বাইপাস করতে হবে তার উপর নির্ভর করে অস্ত্রোপচারের সময়কাল। সাধারণত ৩-৫ ঘন্টা সময়ের মধ্যে বাইপাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারেন। কোন জটিলতা না থাকলে ২ মাসের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। এরপর থেকে রোগীকে নিয়মিত চেকআপের মধ্যে থাকতে হয়।

বিধিনিষেধ

বাইপাস সার্জারির পর রোগীকে বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন– ধূমপান ত্যাগ, কোলেস্টেরলের চিকিৎসা, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত নির্ধারিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা, হৃদ-বান্ধব ভোজনে অভ্যস্ত হওয়া, চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা, নির্ধারিত ওষুধ সেবন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা।

৪. এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

বড় ধরনের অস্ত্রোপচার না করে হৃৎপিন্ডের সংকীর্ণ লুমেন (গহ্বর)-যুক্ত বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া **করোনারি ধমনি** পুনরায় প্রশস্ত লুমেনযুক্ত বা উন্মুক্ত করার পদ্ধতিকে **এনজিওপ্লাস্টি** (angio = রক্তবাহিকা + plasty = পুনর্নির্মাণ) বা **করোনারি এনজিওপ্লাস্টি** (coronary angioplasty) বলে। এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরু বা বন্ধ হয়ে যাওয়া লুমেনের ভিতর দিয়ে হৃৎপিন্ডে পর্যাপ্ত O_2 সরবরাহ নিশ্চিত করে হৃৎপিন্ড ও দেহকে সচল রাখা। বুকে ব্যথা (অ্যানজাইনা), হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির সহজ উপায় এনজিওপ্লাস্টি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মান কার্ডিওলজিস্ট ডা: অ্যানড্রেস গ্রয়েনজিগ (Dr. Andreas Gruentzig) সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

CamScanner

এনজিওপ্লাস্টির প্রকারভেদ

এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্লাক জমা বা রক্ত জমাটের কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) চওড়া করে O_2-সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা। প্লাকের ধরন ও অবস্থান অনুযায়ী এনজিওপ্লাস্টির ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এনজিওপ্লাস্টি নিচে বর্ণিত ৪ ধরনের।

১. **বেলুন এনজিওপ্লাস্টি (Balloon angioplasty) :** এ ক্ষেত্রে একটি বেলুন ক্যাথেটার (baloon catheter) ধমনিতে প্রবেশ করিয়ে কোলেস্টেরলের পিণ্ডগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং রক্তনালিকে খোলা রাখতে সেখানে প্রায়ই একটি স্টেন্ট স্থাপন করা হয়।

২. **লেজার এনজিওপ্লাস্টি (Lesser angioplasty) :** এ ধরনের এনজিওপ্লাস্টিতে ক্যাথেটারের আগায় বেলুনের পরিবর্তে একটি লেজার লাগানো থাকে। করোনারি ধমনির প্লাকযুক্ত অংশে পৌঁছে লেজার রশ্মি স্তরে স্তরে প্লাক ধ্বংস করে এবং গ্যাসীয় কণায় বাষ্পীভূত করে দেয়। শুধু লেজার নয়, এ প্রক্রিয়াটি বেলুন এনজিওপ্লাস্টির পাশাপাশিও প্রয়োগ করা যায়।

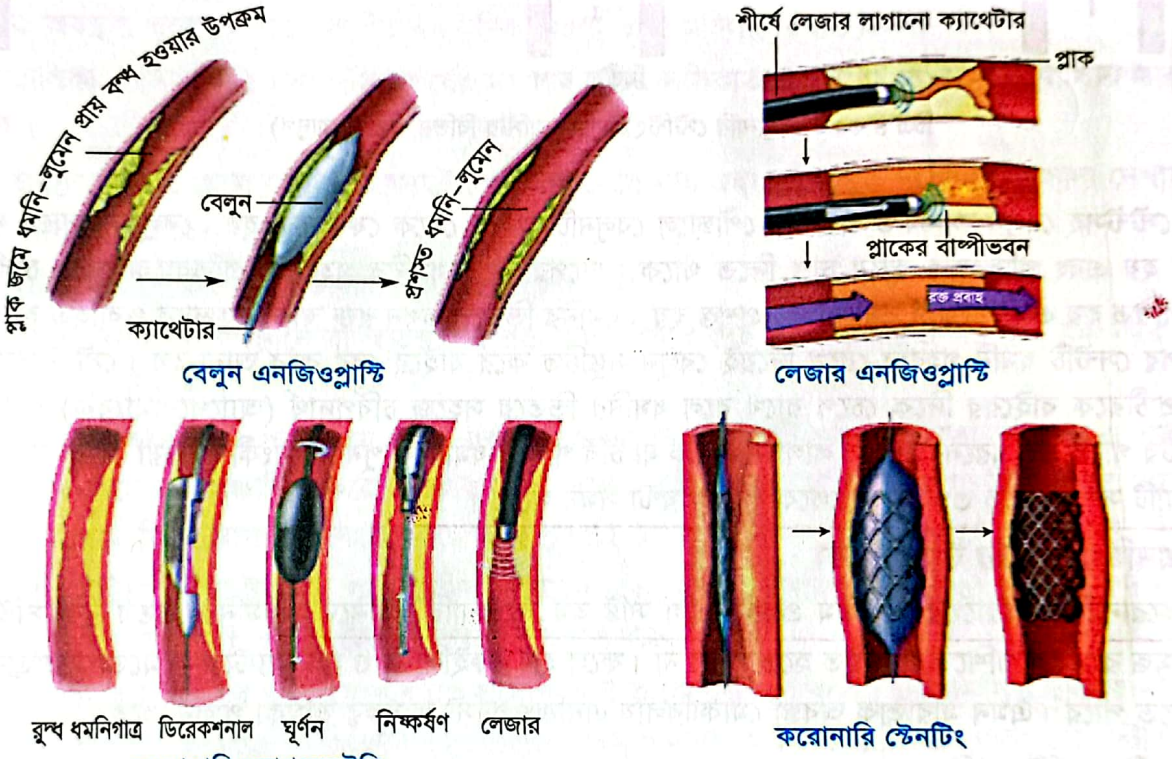

চিত্র ৪.৩৪ : বিভিন্ন ধরনের এনজিওপ্লাস্টি

৩. **করোনারি অ্যাথেরেকটমি (Coronary atherectomy) :** এটিও এনজিওপ্লাস্টির মতো একটি প্রযুক্তি তবে এক্ষেত্রে ধমনি-প্রাচীরের প্লাককে বেলুনের সাহায্যে চেপে লুমেন প্রশস্ত করার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, যেমন ক্ষুদ্র ঘূর্ণী ব্লেড, ড্রিল, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৪. **করোনারি স্টেন্টিং (Coronary stenting) :** স্টেন্ট হচ্ছে ক্ষুদ্র কিন্তু প্রসারণযোগ্য, ধাতব যন্ত্র যা এনজিওপ্লাস্টি সম্পন্ন হলে ক্যাথেটারের সাহায্যে সংকীর্ণ ধমনি-লুমেনে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। লুমেন যেন আবারও সংকীর্ণ না হতে পারে সে কারণে স্টেন্ট-কে সেখানেই রেখে দেয়া হয়। অর্থাৎ যাদের করোনরি ধমনি বেশ নাজুক তাদের ক্ষেত্রে স্টেন্ট অত্যন্ত উপযোগি।

এনজিওপ্লাস্টি প্রক্রিয়া

এনজিওগ্রাম (angiogram) করে নিশ্চিত হওয়ার পর এ ধরনের সার্জারি করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমে উর্ধ্ববাহু বা পা-এর একটি অংশ কেঁটে ধমনির ভিতর দিয়ে পাতলা নল বা ক্যাথেটার (catheter) প্রবেশ করিয়ে কৌশলে রুদ্ধ বা আংশিক বুজে যাওয়া ধমনিতে পৌছানো হয়। ক্যাথেটারে একটি সরু তার, তারের অগ্রভাগে একটি চুপসানো বেলুন

CamScanner

ও বেলুনটির চারদিকে একটি ধাতব তারের জালের চোঙ বসানো থাকে। জালিকাটিকে স্টেন্ট (stent) বলে। স্টেন্টটি সাধারণত বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত। এখন অবশ্য অন্যান্য ধাতব বা বিশেষ ধরনের সুতার তৈরি স্টেন্টও ব্যবহৃত হয়।

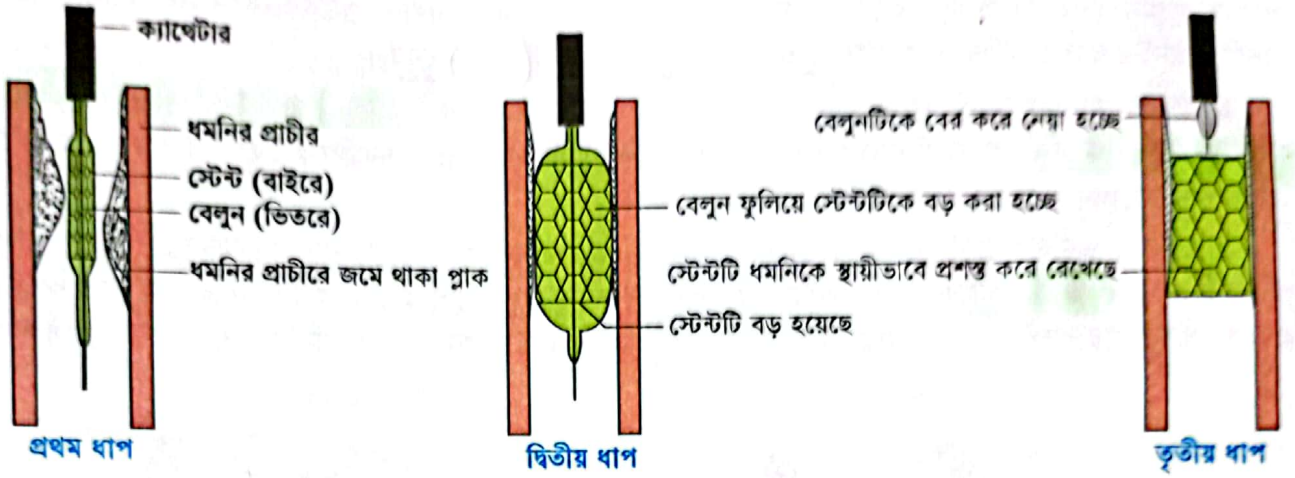

চিত্র ৪.৩৫ : করোনারি স্টেন্টিং এনজিওপ্লাস্টির বিভিন্ন ধাপ (চিত্রানুগ)

স্টেন্টসহ বেলুন কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছালে বেলুনটি বাইরে থেকে ফোলানো হয়। বেলুনের সাথে সাথে স্টেন্টও স্ফীত হয় এবং প্রতিবন্ধক স্থানে চাপ দিতে থাকে। চাপের ফলে ধমনির গহ্বরের প্রতিবন্ধক স্থানে চর্বিযুক্ত পদার্থও নিষ্পেশিত হয় এবং সংকীর্ণ ধমনিগহ্বর প্রশস্ত হয়। ধমনির ভিতরে তখন রক্ত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর পর সেন্টটি ধমনি গহ্বরে রেখে দিয়েই বেলুন সঙ্কুচিত করে বাইরে বের করে আনা হয়। স্টেন্ট সবসময় ধমনির অন্তঃপ্রাচীরকে বাইরের দিকে চেপে রাখে বলে ধমনির ভিতরে সহজে চর্বিপদার্থ (অ্যাথেরোমা/ব্লক) জমতে পারেনা। স্টেন্টের গায়ে এক ধরনের প্রলেপ লাগানো থাকে যা চর্বি গলিয়ে ধমনিকে পুনরায় সংকীর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৩০ মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।

এনজিওপ্লাস্টির উপকারিতা

করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভিতর ব্লক সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত O_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এমন মারাত্মক অবস্থা মোকাবিলায় এনজিওপাস্টি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এনজিওপ্লাস্টি ধমনির লুমেন থেকে ব্লক অপসারণ বা হ্রাস করতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয়। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। যেহেতু বুক উন্মুক্ত করতে হয় না সেহেতু কষ্ট, সংক্রমণ ও দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না। মাত্র এক থেকে কয়েক ঘন্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা সম্ভব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি লাগে না।

যাঁরা বৃক্কের অসুখে ভুগছেন, কিংবা এনজিওগ্রামের সময় রঞ্জকের প্রতি অ্যালার্জি দেখা দেয় এবং যাঁদের বয়স ৭৫ বছরের বেশি তাঁদের ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি : অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টির তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার শুরুতে, বিশেষত স্টেন্টিং করার সময় ২% রোগীর ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। আবার বেলুন ছিড়ে কিংবা স্টেন্ট চুপসে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। ক্যাথেটার প্রবেশের সময় ধমনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এনজিওপ্লাস্টি করার পর রোগীর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রিং লাগানো অংশটিতে রক্ত জমাট বাঁধে এবং জমাটবদ্ধ রক্ত ছুটে গিয়ে মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিকে রুদ্ধ করে স্ট্রোক ঘটাতে পারে। আবার রিং-এর ভিতরে কয়েক মাস বা এক বছরের মধ্যে নতুন করে অ্যাথেরোমা সৃষ্টি হতে পারে।

CamScanner

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. রক্ত বিশেষ ধরনের প্রবহমান তরল যোজক টিস্যু যা অধিক আয়নিক ঘনত্বের দ্রবণ প্লাজমা ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত এবং যা হৃৎপিন্ড ও বদ্ধ রক্তনালির মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়।

২. রক্তের ঈষৎ ক্ষারধর্মী হালকা হলুদ বর্ণের অকোষী তরল অংশকে প্লাজমা বা রক্তরস বলে।

৩. রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে পানি, খাদ্যসার, অক্সিজেন, এনজাইম, হরমোন প্রভৃতি কোষে সরবরাহ হয়, এবং দেহের তাপ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়ার মতো নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্যবস্তুসমূহ দেহ থেকে অপসারিত হয়।

৪. মানব ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ে কুসুম থলিতে, মধ্যবর্তী পর্যায়ে যকৃতে এবং শেষ পর্যায়ে জন্মের পর থেকে অস্থিমজ্জাতে যে পদ্ধতিতে লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় তাকে এরিথ্রোপোয়েসিস বলে।

৫. রক্তে লোহিত রক্তকণিকার আয়তন পরিমাপের শতকরা হিসেবকে হেমাটোক্রিট বলে। আয়তনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা ৪৫% এবং মহিলাদের ৪০%।

৬. লসিকাজালিকা, লসিকানালি এবং লসিকাপর্বের সমন্বয়ে গঠিত লসিকাতন্ত্রের মধ্যে যে তরল দেখা যায় তার নাম লসিকা।

৭. অধিক চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকাতে ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকাকে দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে কাইল বলে।

৮. অন্ত্রের প্রাচীরের সুবিকশিত লসিকানালিকে ল্যাকটিয়েল বলে।

৯. যে প্রক্রিয়ায় কেটে যাওয়া স্থানে বা ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বেঁধে দেহ হতে অবাঞ্ছিত রক্তপাত বন্ধ করে তাকে রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া বলে।

১০. হৃৎপেশি নামক অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত রক্ত সংবহনতন্ত্রের যে অঙ্গটি পাম্পের মতো সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত করে তাকে হৃৎপিণ্ড বলে। এটি ছান্দিক গতিতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত বাহিকার মাধ্যমে ফিরে আসা রক্ত সংগ্রহ করে এবং পুনরায় তা বাহিকার মাধ্যমে সারাদেহে প্রেরণ করে।

১১. হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়া ও ভেন্ট্রিকলের পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন (systole) ও প্রসারণ (diastole) কে হৃৎস্পন্দন (heart beat) বলে। এর মাধ্যমেই রক্ত দেহের অভ্যন্তরে গতিশীল থাকে।

১২. প্রবহমান রক্ত রক্তবাহিকার গায়ে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বলে। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক চাপ ১০০–১৩৯ (অপটিমাম ১২০ mmHg) মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৬০–৮৯ (অপটিমাম ৮০ mmHg) মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান হয়ে থাকে। স্ফিগমোম্যানোমিটার (sphygmomanometer) নামক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের রক্তচাপ মাপা যায়।

১৩. হৃৎস্পন্দনের সময় হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের জন্য ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি ঘটনা ঘটে। একটি হৃৎস্পন্দনে সংঘটিত ধারাবাহিক ঘটনার সমষ্টিকে হৃৎচক্র বা কার্ডিয়াক চক্র বলে।

১৪. মানুষের হৃৎপিণ্ড স্নায়ুতন্ত্র, হরমোন বা অন্যকোনো উদ্দীপনা ছাড়া নিজেই স্পন্দন তৈরি করতে পারে। এজন্য একে মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড বলে। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ ধরনের কিছু রূপান্তরিত সংযোগী টিস্যু সম্মিলিতভাবে হৃৎস্পন্দন উৎপাদন ও দ্রুত বিস্তার ঘটিয়ে হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। সংযোগী টিস্যুগুলো হলো– সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড (SAN), অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড (AVN), বাণ্ডল অব হিজ এবং পারকিঞ্জি তন্তু।

১৫. রক্তনালিকার প্রাচীরে অবস্থিত বিশেষ সংবেদী স্নায়ুপ্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর বলে। এরা রক্তচাপ পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে দেহে রক্তচাপের ভারসাম্য বা হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখে। রক্তনালিতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ সৃষ্টি হলে ব্যারোরিসেপ্টর খুব দ্রুত এ উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে। এরপর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদ্ধতিকে ব্যারোরিফ্লেক্স বলে।

CamScanner

১৬. মানুষের হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন করে। মানবদেহে প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড (SAN) নামক বিশেষ ধরনের টিস্যু থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে সমগ্র হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং স্পন্দন ছন্দোময়তা বজায় থাকে। সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোডকে পেসমেকার বলে।

১৭. মানুষের রক্তসংবহনতন্ত্রে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সিস্টেমিক চক্র ও পালমোনারি চক্র– এ দুটি চক্রে সম্পন্ন হয় বলে এ সংবহনকে দ্বিচক্রী সংবহন (double circuit circulation) বলে।

১৮. যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে ধমনির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশের জালকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐ সকল জালক থেকে রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। এ সংবহনের মাধ্যমে দেহের সকল কোষ, টিস্যু ও অঙ্গে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ হয় এবং CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে।

১৯. যে সংবহনে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে প্রেরিত হয় এবং ফুসফুস থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে তাকে পালমোনারি সংবহন বলে।

২০. যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব পেশিতে রক্ত সংবাহিত হয় তাকে করোনারি সংবহন বলে। সিস্টেমিক ধমনির গোড়ায় অবস্থিত করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

২১. কোনো কোনো অঙ্গের কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় কৈশিকজালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের সংবহনকে পোর্টাল সংবহন বলে। মানবদেহে শুধু হেপাটিক যা যকৃত পোর্টাল তন্ত্র বিদ্যমান। রেনাল বা বৃক্কীয় পোর্টাল তন্ত্র থাকে না।

২২. হৃৎপিণ্ডের পেশিতে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনির ভিতরের প্রাচীরে কোলেস্টেরল সঞ্চিত হলে এ ধরনের সঞ্চিত পদার্থকে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক বা অ্যাথেরোমেটাস প্লাক বলে। এই প্লাকের জন্য ধমনির গহ্বর সরু হওয়ার ফলে হৃৎপেশিতে পর্যাপ্ত O_2 ও পুষ্টি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে করোনারি হৃদরোগ বা ইস্কিমিয়া বলে। অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর ইত্যাদি করোনারি হৃদরোগ। করোনারি ধমনির অস্বাভাবিকতার জন্য এ রোগগুলো সৃষ্টি হয়।

২৩. হৃৎপিণ্ডের কোন অংশে দীর্ঘদিন ধরে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহের অভাব ঘটলে ঐ অংশের পেশিগুলো অকেজো হয়ে বা মরে গিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে।

২৪. চিকিৎসকরা যখন বক্ষের অস্থিকে কেটে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করেন এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে অপারেশনের মাধ্যমে হার্টের সমস্যাগুলো দূরীভূত করেন তখন তাকে ওপেন হার্ট সার্জারি বলে।

২৫. করোনারি ধমনির ভিতরে ব্লক তৈরি হয়ে যদি হৃৎপেশিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয় তবে উক্ত রক্ত বিকল্প আরেকটি পথে হৃৎপেশিতে পৌঁছানোর পদ্ধতিকে করোনারি বাইপাস বলে।

২৬. ক্যাথেটার হলো একটি নমনীয়, লম্বা ও সরু টিউব বিশেষ যার দ্বারা করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশে একটি করোনারি স্টেন্ট (coronary stent) বা রিং স্থাপন করা হয়। এটি যান্ত্রিক পেসমেকার ও এনজিওপ্লাস্টিতে ব্যবহার করা হয়।

২৭. এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে এক ধরনের চিকিৎসা, যার সাহায্যে ধমনির যে অংশে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ ও রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সে জায়গাটিকে প্রসারিত করা। এনজিওপ্লাস্টির ফলে করোনারি ধমনি দিয়ে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ঘটে এবং হৃৎপিণ্ড সচল থাকে।

CamScanner